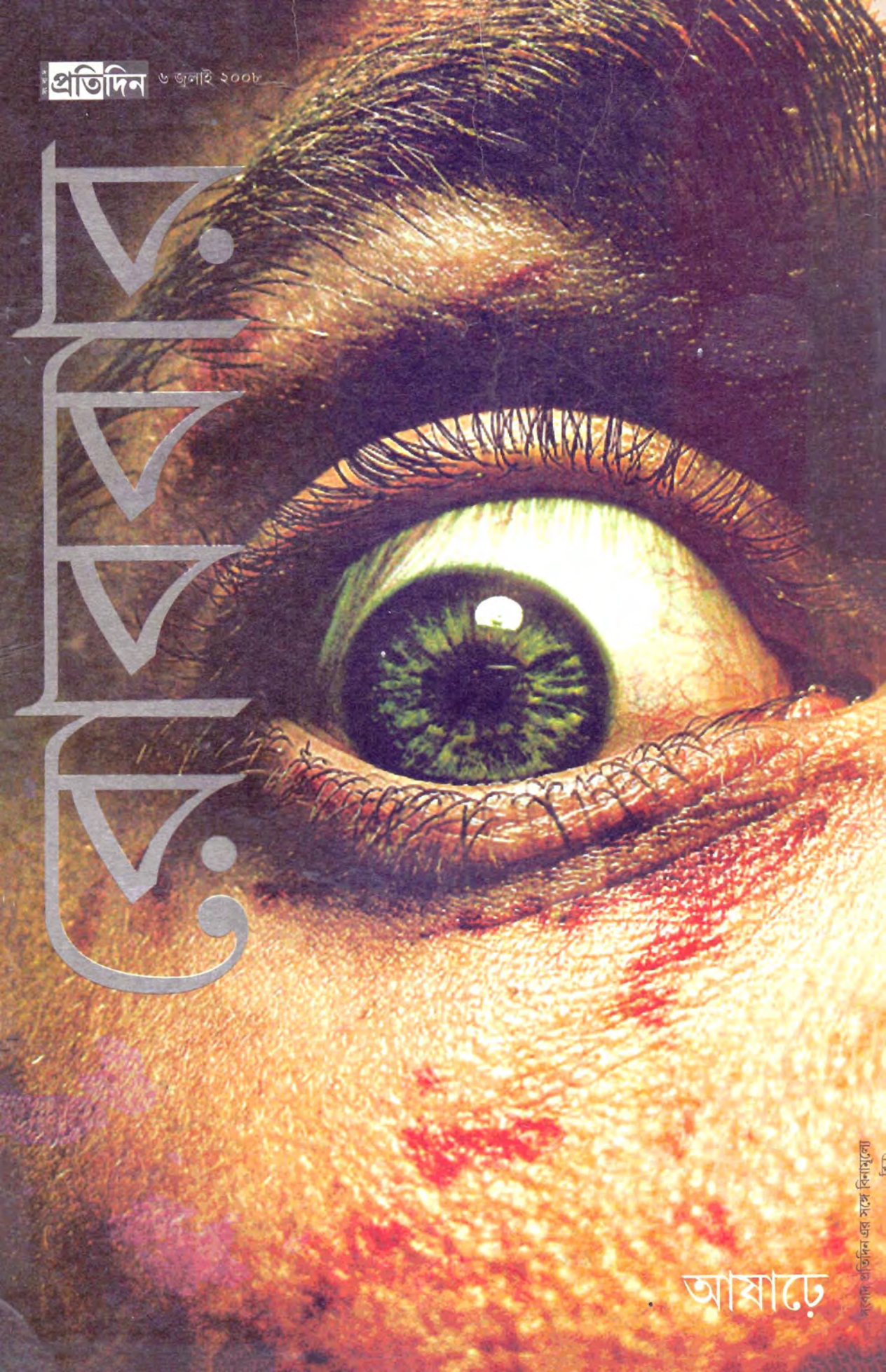

সংবাদ প্রতিদিন
৬ জুলাই ২০০৮
রোববার
আষাঢ়ে
সংবাদ প্রতিদিন এর সঙ্গে বিনামূল্যে

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

রথেররশিতেপড়লটান
গয়নাকিনেপুরীযান।

রথযাত্রায় কিনুন গয়না,
জিতে নিন ৩ দিন, ২ রাত পুরী বা মায়াপুর বেড়ানোর প্যাকেজ !!
এছাড়াও রয়েছে প্রতিদিন গিফট্ ভাউচার জেতার সুযোগ।
গয়নার মজুরীর উপর ৫০% অবধি ছাড়-ও রয়েছে !!

অঞ্জলি জুয়েলার্স®
সবার জন্য

শুধুমাত্র
৪-১২ জুলাই
২০০৮

গোলপার্ক - ২৮এ গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা ২৯, ফোন : ২৪৪০ ১৭৯২/২৪৬০ ০৫৮১
শোভাবাজার - ৩৮ অরবিন্দ সরণী, শোভাবাজার মেট্রো স্টেশনের পাশে, কলকাতা ৫, ফোন : ২৫৩৩ ৫৮৩২/৩৪
সল্টলেক - বি. ই. ১০১, কোয়ালিটি মোড়, কলকাতা ৬৪, ফোন : ২৩২১ ২০৫৭/২৭৮৬
সল্টলেক - এইচ. এ. ৩, জিডি আইল্যান্ডের পাশে, কলকাতা ৯৭, ফোন : ২৩২১ ৮৩১০/১১
বেহালা - ৫২২সি ডায়মন্ডহারবার রোড, স্টেট ব্যাঙ্কের পাশে, কলকাতা ৩৪, ফোন : ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫
এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই।

রবিবার, ৬ই জুলাই দোকান খোলা থাকবে।

www.anjali.bz

দোকান সকাল ১০.৩০ থেকে রাত ৮.৩০ পর্যন্ত খোলা।

৬ জুলাই ২০০৮

রোববার

সংবাদ প্রতিদিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে

ফার্স্ট পার্সন
ঋতুপর্ণ ঘোষ ৪

জিমখানার সেই অতিথি
নবনীতা দেবসেন ৬
আসলে কী ঘটেছিল
ইমদাদুল হক মিলন ১০
হায় রান!
স্বপ্নময় চক্রবর্তী ১৪

রবিশংকর বল ১৮
পোস্টম্যান
প্রচেত গুপ্ত ২২
হাওয়া যায় হাওয়া আসে
অমর মিত্র ২৮
আচ্ছায়াতে
দীপান্বিতা ঘোষ মুখোপাধ্যায় ৩৪
ধন্যবাদ চুক্তি
রমানাথ রায় ৪০

সৌজন্য
অর্চিতা সেন
রুণা মণ্ডল
শেলি মণ্ডল

টিম রোববার

গীতিষা দাশগুপ্ত
তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
নীলাঞ্জনা বসু
প্রসূন চক্রবর্তী
বর্ণিনী মৈত্র চক্রবর্তী
বিপুল গুহ
রিংকা চক্রবর্তী
রাজু সরদার
শান্তনু দে
সুপ্রিয় দাস

সম্পাদক ঋতুপর্ণ ঘোষ
সহযোগী সম্পাদক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক
বি এল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

ফা
ফার্স্ট
পার্সন

কে বিখ্যাত করল আষাঢ়কে?

কালিদাস? 'ঢ'য় শূন্য ঢ়? না, ডাকব্যাক?

শহরে বসে আমরা টেরই পাইনা আষাঢ় মাসের আনাগোনা।

আমাদের এখানে সে Monsoon। তার official arrival date ক্রমে ক্রমে পিছচ্ছে।

আগে যখন স্কুলে পড়তাম, তখনও ছিল দিনভর তুমুল বৃষ্টি। মাগনায় পাওয়া 'রেইনি ডে'র ছুটি।

খিচুড়ি, বেগুনি, মাছভাজা—আর ভূতের গল্প। বৃষ্টির আশায় হাপিত্যেশ বসে থাকলে বছরকার ভূতের গল্প শোনার গা ছমছমটাও হয়তো কখন পার হয়ে যাবে, জানতেই পারব না। তাই, আজ রোববার-এ, ভূতের গল্পের আসর।

বাংলাভাষার কত যে সোনার দোয়াত কলম কত ভূতকে অমর করেছে, তার ঠিক ঠিকানা নেই।

তারই ঐতিহ্য বেয়ে আজকের যুগের নবীন, প্রবীণরা ভূতের গল্প লিখলেন আমাদের 'আষাঢ়ে' সংখ্যায়।

দেখা যাক! ছেলেবেলার সেই 'রেইনি ডে'র স্মৃতি ফের ফিরে আসে কি না!

'বাইরে কেবল জলের শব্দ, ঝুপ ঝুপ ঝুপ
দস্যি ছেলে গল্প শোনে একেবারে চুপ
বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান
বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর নদেয় এল বান।'

ঋতুপর্ণ ঘোষ

ভয়ংকর সেই অতিথি

নবনীতা দেবসেন

আ
আষাঢ়ে

জিমখানা ক্লাবে বুকিং ছিল আমাদের মা-মেয়ের। একতলার কামরা চাই। আমি সিঁড়ি চড়তে পারি না আপাতত। কিন্তু নীচে ঘর নেই। অনেকক্ষণ ধরে গাঁইগুঁই করে ওরা একটা দুই কামরার সুইট খুলে দিল, কিন্তু বারবার বলল ওপরের ঘরগুলো বেশি সুন্দর। ম্যাডাম, পারলে ওপরে যান। নীচে ভাল নয়। আরে এটাকেই তো 'ডিলুক্স ঘর' বললে, দামও ডিলুক্স, আমায় আরও ভাল দিয়ে কাজ নেই। কিন্তু কমলি নেহি ছোড়েগি। ম্যাডাম এসেছেন তো চোখ দেখাতে, তার সঙ্গে সিঁড়ি চড়ার কী যোগ? আরে অত সহজে কি সব বলা যায়? ম্যাডামের শ্রীচরণ আছেন, শ্রীকোমর আছেন, শ্রীজানু আছেন, নেহাৎ দেহের নীচের তলা বলে কি তাদের স্বাধীনতা প্রতিরোধের শক্তি চোখের চেয়ে কম? তাছাড়া শ্রী ফুসফুসও আছেন বৈকি। অনেক তর্ক করে একটা কোণের দিকের দু-কামরার ঘরে আমরা ঠাঁই পেলুম—লম্বা অন্ধকার, গা ছমছমে করিডোরের শেষে দুটি দরজা, তার একটি খুললে আমাদের ঘর, মন্দ নয়। জানালা দিয়ে ছোট একটা প্রাইভেট সবুজ লন দেখা যায়। ক্ষুদে বৈঠকখানা ঘরের কাচের দরজা খুলে তাতে নামাও যায়। অনেকগুলি বড় বড় গাছ আছে, পর্ণমোচী, শুকনো পাতা উড়ছে সর্বত্র হলুদ প্রজাপতির মতো। কয়েকটি সাদা চেয়ার পাতা আছে সবুজ ঘাসে, গাছের নীচে। কোকিল ডাকছে। ভারী সুন্দর। পিকো দরজা খুলে লনে বেরুতে গিয়ে ধাক্কা খেলো। দরজা বাইরে থেকে তালা বন্ধ। ওতে আটকানো যাবে না আমাদের। ডাকো বেয়ারাকে, খোলো তালা। সরি ম্যাডাম, ওটার চাবি হারিয়ে গিয়েছে, তালা ভেঙে নতুন তালা লাগানো দরকার। ততদিন লনে বেরুনো সম্ভব নয়। অগত্যা ঠিক আছে। লনে বসবার কতটুকুই বা সময় পাব আমরা? প্রতিদিন সারা দিনই তো কাটবে হাসপাতালে। ফিরব শুধু ঘুমোতে। ইদানীং আমার প্রতিবাদী উগ্র স্বভাব বদল হয়ে হয়েছে মোটামুটি মৃদু মধুর। প্রত্যহের তুচ্ছ অস্বাচ্ছন্দ্যগুলি যথাসাধ্য মেনে নিয়ে শান্তিপূর্ণ দিবস রজনীর চেয়ে বেশি কিছু প্রার্থনা করি না আর। প্রতিবাদের জায়গাটা এখন ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের বাইরে। মেয়ে তো সেই অবস্থায় পৌঁছয়নি, এখনও সে সব কিছুকেই ত্রুটিহীন, নিশ্ছিদ্র, নির্ভুল দেখতে চায়। কিন্তু চাবি মিলল না লনের।

হাসপাতালের সারাদিনের ক্লান্তির পরে ঘরে ফিরে, চমৎকার বিলিতি চুরুটের গন্ধ আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। সন্ধের আধো অন্ধকারে বাইরের লনে চেয়ারে পিছন ফিরে বসে আছেন বয়স্ক কেউ। কেমন করে ঢুকলেন ওখানে? বাইরে দিয়ে কোনও দরজা আছে নিশ্চয়ই পাশের ঘরের সঙ্গে লাগোয়া, যার চাবি হারিয়ে যায়নি। বিছানাতে শুয়েই টের পেলুম চোখ ঘুমে ভেঙে আসছে। ঘুমিয়ে পড়লুম দু'জনেই। রাত কত জানিনা, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। আমার তো চোখে ব্যান্ডেজ, মনে হল আমার পাশেই কেউ শুয়ে আছে, প্রগাঢ় নিদ্রায়, ভোঁস ভোঁস করে ছন্দে ছন্দে তার নিঃশ্বাস পড়ছে।

ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

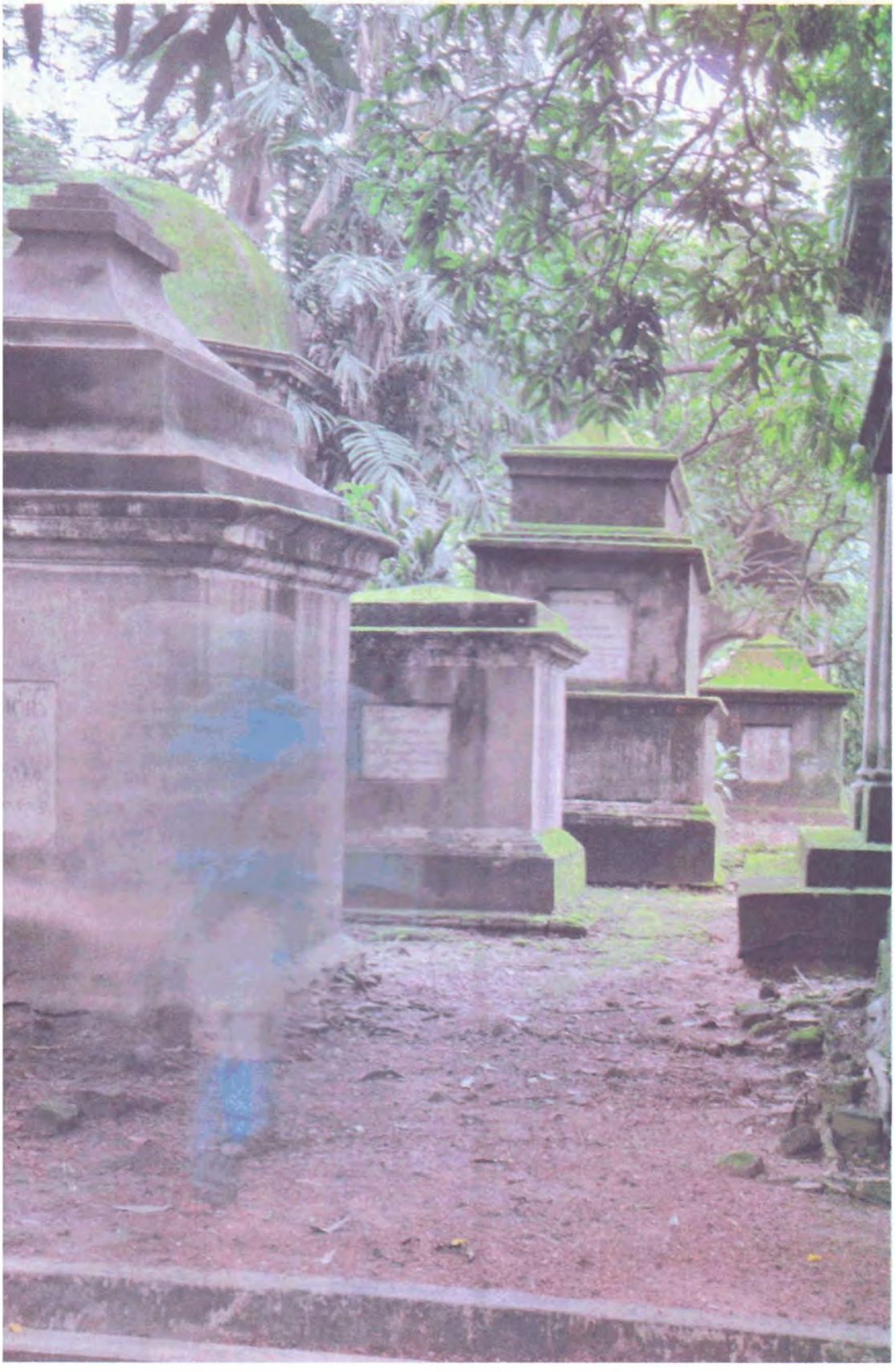

কিন্তু পাশে তো পিকো! ও বাবা, পিকো, তোর অতটুকুনি শরীরে অমন প্যালারাম বিশ্বাসের মতো ফোঁস ফোঁস এত জোরে নিশ্বাস ফেলছিস? এ যেন আমার ছ'ফুট বাবার মৃদু নাসিকা গর্জনের মতো শোনাচ্ছে।

'পিকো পাশ ফিরে শো।' পিকো ঘুম ভেঙে অবাক ঘুমন্ত গলায় বলে, 'কেন, মা? হঠাৎ?' এবং অন্ধকারে সেই নাসিকার সুরধ্বনি ছন্দে ছন্দে বেজেই চলতে থাকে। যেন একেবারে গায়ের ওপরে। কিন্তু ঘরে তো আর খাট নেই। 'ওটা আবার কীসের শব্দ হচ্ছে?' জাগ্রত পিকোর ভ্রূ কুঁচকোনো প্রশ্নের উত্তরে এবারে আমি বলি, 'পাশের কামরার লোকের নাক ডাকছে নিশ্চয়ই।' চুপ করে অন্ধকারে আমরা কিছুক্ষণ শুনি কী সুন্দর সুষম শব্দ করে পড়ছে শান্ত ঘুমন্ত নিশ্বাস। বুক যেন উঠছে নামছে ছন্দে ছন্দে। যেন জগতে কোনও দুশ্চিন্তা নেই। শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। একটু পরে আবার ঘুম ভেঙে গেল আমার। এবারে ওঘরে খুব জোরে জোরে একটা কিঁ-চ কিঁ-চ আওয়াজ হচ্ছে, বেজি, ছুঁচো, কিংবা ধেড়ে ইঁদুরের ব্যতিব্যস্ত ডাকাডাকির মতো। ও ঘরে ইঁদুরদের যুদ্ধ মারামারি কিছু চলছে নাকি? নাসিকা ধ্বনি থেমে গিয়েছে। বেশ খানিকক্ষণ কিঁচি কিঁচি চলল। বেজিতে সাপ মারলে কি এরকম শব্দ হয়? কে জানে? পিকোও জেগে গিয়েছে। কীসের শব্দ এটা হতে পারে আমরা তার ব্যাখ্যা খুঁজে পেতে না পেতেই ও ঘরে শুরু হল ভারী ফার্নিচার টানা হ্যাঁচড়ানির সুপরিচিত আওয়াজ। এত রাতে ভারী আসবাবপত্তর টানাটানির কী দরকার থাকতে পারে মানুষের? জবরদস্ত আওয়াজ হচ্ছে। এরা না সাহেবি ক্লাব? সারা রাত ধরে এতরকম আওয়াজ করা কোন দেশের বিলিতি ভদ্রতার কায়দা? পাশের ঘরের অতিথিদের কথাও ভাবতে হয় তো? পাখির ডাক শুরু হয়েছে। পর্দার বাইরের অন্ধকার হাল্কা হয়ে এসেছে। ফার্নিচার টানাটানি একসময়ে বন্ধ হল। আমরা ঘুমিয়ে পড়ি।

পরের দিন হাসপাতালের পথে পিকো বলে, 'কাল রাত্রের ব্যাপারটা খুব মিস্টিরিয়াস, না মা? কারা থাকে বলো তো ও ঘরে?'

আমি বলি—'তুই যতটা ভাবচিস, তার চেয়েও বেশি। ওই কামরাতে কেউ নেই। কেউ থাকে না। কোনও আসবাবপত্তরও নেই

'তাহলে? কীসের শব্দ শুনেছি আমরা সারা রাত?'

'টেলিফোনে আমি ম্যানেজারমশাইকে জানিয়েছিলুম, সারা রাত এক ভারী মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্পষ্ট শুনেছি। তারপরে ইঁদুরদের ঝগড়ার কিঁচ কিঁচ, তারপরে আসবাবপত্তর নাড়ানাড়ি। অথচ বেয়ারা বলছে ও ঘরে কেউ থাকে না। থাকে না মানে? রাবিশ! আলবাত থাকে। কে আছে? তাকে বলুন রাত্রে অত আওয়াজ না করতে।'

ম্যানেজার বললেন, 'খুব দুঃখিত, কিন্তু আপনাদের তো ও ঘরে আমি দিতে চাইনি ম্যাডাম। আপনি জোর করে ওই কামরাতে গেলেন। ওটা বদল করে ফেলুন। আজ ওপরে চলে যাবেন?'

'অনেকদিন আগে নাকি ওই ঘরে এক মাতাল সাহেব দু'দিন বেঘোরে এমনই অজ্ঞান হয়ে ঘুমিয়েছিলেন যে, তাকে মরা ভেবে ধেড়ে ইঁদুরেরা শরীর খুবলে খেয়ে নিয়েছিল, তিনি তাও টের পাননি। বেচারা ওদের অত্যাচারেই মারা যান। ইঁদুরেরা তাঁর চোখ কুরে খেয়ে নিয়েছিল। যাই হোক, আপাতত ওই ঘরে কেউ নেই। কাল রাতেও কেউ ছিল না। খালি ঘর। ওটা আনঅকুপায়েড। ওদের এসব বাজে আজগুবি কথা তুই তা বলে বিশ্বাস করিস না যেন। যত্তো গাঁজাখুরি গপ্পো!' পিকো বললে 'সে তো বুঝলুম, কিন্তু কাল রাত্তিরে ব্যাপারটা আসলে কী হয়েছিল, সেটা জানতে হবে তো?'

রাত্রে ফিরে এসে শুয়েছি। ও ঘরে আজ কোনও শব্দ নেই। নিস্তব্ধতার শান্তি ঢেকে রেখেছে আমাদের অন্ধকার পরিশ্রান্ত অন্তর বাহির। মাঝে মাঝে বাইরের বড় গাছের কোনওটাতে এক নাম না-জানা রাতপাখি ডেকে উঠছে পিকো আর আমি শুয়ে শুয়ে গল্প করছি, আমার চোখে ব্যান্ডেজ। অন্ধকারে নাকে ভেসে এলো চুরুটের হাল্কা সুবাস। একটু পরে মেয়ে বলল, 'কই, মা, আজ তো নাক ডাকাচ্ছেন না তিনি?' শুনে আমি হাততালি দিয়ে হেসে

গড়িয়ে পড়ি। এবারে সত্যি কথাটা বলেই ফেলি। 'আরে ধেৎ! ওসব সত্যি নাকি, ওই গল্পটা তো আমি তোকে তক্ষুনি বানিয়ে বানিয়ে বললুম। ম্যানেজারের সঙ্গে আমি কথাই বলিনি, কেউই আমাকে কিচ্ছু বলেনি, আমার সময় হল কখন? তুই যেখানে আমিও তো সেখানে। দ্যাখ তোকে কেমন ঠকান ঠকিয়েছি?' পিকো রেগে গিয়ে বলে ওঠে 'ইস, খালি ইয়ার্কি! খালি খেলা! এসব ক্রিয়েটিভ রাইটারদের সঙ্গে বাস করা কঠিন। আমাদের জার্নালিস্টদের আলাদা এথিক্স। তোমাদের স্টোরিতে কোনটা সত্য, আর কোনটা যে বানানো—বলতে না বলতেই,—'কিঁচ!' হঠাৎ আলো নেবানো অন্ধকার ঘরে দুটো ছোট্টো সবুজ আলো জ্বলে ওঠে, মেঝের কাছাকাছি। কোথায় যেন চেয়ার টানার শব্দ হয়, কী যেন উল্টে পড়ল আমাদের বসার ঘরে।

এক মুহূর্তের জন্যে হিম হাওয়া নেমে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে।

খুদে সবুজ আলো দুটো অন্ধকারে স্থির হয়ে আছে। এক দৃষ্টে এদিকে তাকিয়ে। তার পিছনে আরও একজোড়া সবুজ আলো জ্বলে উঠল।

'পিকো, র‍্যাট!'

উঠে বসে হাতড়ে খাটের পাশের টেবিলের আলো জ্বালে পিকো।

কাঁচা ঘুম ভেঙে গিয়ে রাগ রাগ গলায় মেয়ে আমায় বলে,

'কই র‍্যাট? তুমিই আহ্লাদ করে ওই সব অলুক্ষুণে গল্প বানিয়ে এদের ডেকে এনেছ মা।'

হঠাৎ আমি আঁতকে উঠে খাটের ওপরে পা গুটিয়ে নিই। একটা মস্ত ধেড়ে ইঁদুর নিঃশব্দে ছুটে পালাল, কে জানে কোথা দিয়ে এ ঘরে এসেছিল, কোথা দিয়েই বা বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে খাটের পাশে ওলটপালট খেয়ে পড়ে গেল বেড সাইড টেবিল ল্যাম্পটা। বার দুই দপদপ করেই নিবে গেল। এর পরে গভীর অন্ধকারে ডুবে গেল চরাচর। তারই মধ্যে আমরা নির্বাক, চোখ কান খাড়া করে একাগ্র মনে, যাকে সাদা বাংলাতে বলে 'কাঠ হয়ে' খাটের ওপরে স্তব্ধ বসে আছি মা মেয়েতে। কী হয় কী হয়। চুরুটের মৃদু গন্ধটা তীব্র হয়ে উঠছে কী?

নাঃ, আর কিছু ঘটেনি সে রাতে। খানিক বসে থেকে আমরা ক্রমে রিল্যাক্স করি। ক্লান্ত শরীর দুজনেরই। ওই অল্পস্বল্প খুটখাট ক্যাঁচকোঁচ একটানা আওয়াজের মধ্যেই এক সময়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি আমরা। বাথরুমের আলোটা জ্বেলে রাখি। সে রাতে আর আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি।

পরের দিন সকালে উঠে পিকো বল্লে, 'মা গো, তোমার গল্পসল্প তুমি রাখো, আজ আমি এর একটা হেস্তনেস্ত করতে চাই। আমাদের জানতেই হবে সারা রাত ধরে পাশের ঘরে ওই বিচিত্র আওয়াজের বাস্তবিক উৎস কোথায়?' প্রাতরাশের সময়ে এখানকার প্রাচীনতম অভিভাবক, ক্লাবের বুড়ো বেয়ারা ফের্নান্দেজকে পাকড়ে পিকো প্রশ্নটা করেই ফেলে। শান্তভাবে বুকে ক্রুশের চিহ্ন এঁকে ফের্নান্দেজ বলে, —'আহা সাহেবের কথা থাক না ম্যাডাম। যুদ্ধে সোনার মেডেল পেয়েছিল। কিন্তু বড় দুঃখী লোক। ভুল করে মৃত্যু সংবাদ চলে এসেছিল ওর বাড়িতে। স্ত্রী সেই শুনে ওকে ছেড়ে অন্যের কাছে চলে গেল। যুদ্ধের শেষে ফিরে এসে সাহেব দেখল ওর ঘরে কেউ নেই। সেই থেকে ক্লাবেই বেশি থাকত, ওই একটু বেশি বেশি নেশা করত। সেই নেশাই ওর কাল হল। ওঃ কী বীভৎস সেই মৃত্যু! আমি ডিউটিতে ছিলাম সেদিন। সে যাক, সাহেব কিন্তু কখনও কারুর কোনও ক্ষতি করে না। শুধু তো নেশা করে ঘুমিয়ে থাকে। কিংবা লনে বসে একটু চুরুট খায়। ওকে আপনাদের ভয়ের কিছুই নেই। ওই কামরাতে এখন ভাঁড়ার ঘর করেছে ক্লাব, তাই একটু ইঁদুরের দৌরাত্ম্য হয়। ওরাই এটা ওটা ফেলে দেয়, কাবার্ড খোলার চেষ্টা করে, কৌটো টানাটানি করে, খুব ষণ্ডা-গুন্ডা ইঁদুর তো সব? ওই ওরাই একটু রাতে শব্দ টব্দ করে, ঘুমের ডিস্টার্বেন্স হয়, কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। নিন, খেয়ে নিন ম্যাডাম, আপনাদের চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। কিচ্ছু ভয় নেই, এই ইঁদুরগুলো সেই জংলি ইঁদুরের মতো নয়, এরা সব একদম নিরীহ, ভিতু, তেড়ে আসে না, কামড়ে টামড়ে দেয় না। মেজরও খুব ভদ্রলোক ছিলেন। পারফেক্ট জেন্টলম্যান!'

'আমার তৈরি' আজগুবি গল্পটা তবে সেদিন আমাকে মনে মনে বলে গেল কে?

ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে এক নতুন দিগন্ত

বৈদ্যনাথ মধুমেহারী কলিকাতার একটি বিখ্যাত হাসপাতালে ব্লাড সুগারের রোগীদের উপর ৮৩% সাফল্যের সাথে পরীক্ষিত হয়েছে।

কুড়িটি ঔষধির সমাহার, বৈদ্যনাথ মধুমেহারী রক্তে শর্করার পরিমাণ কমিয়ে আনে এবং অগ্ন্যাশয় গ্রন্থিকে (প্যাংক্রিয়াস) উজ্জীবিত করে, যাতে ইনসুলিনের পরিমানও বৃদ্ধি পায়, এমনকি ব্লাড সুগার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রোগের প্রকোপও রোধ হয়।

(ইনসুলিন নির্ভর রোগীরা চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনোমতেই 'ইনসুলিন থেরাপী' বন্ধ করবেন না।)

বৈদ্যনাথ
মধুমেহারী
দানা

নিরাপদ, প্রাকৃতিক এবং কার্যকরী

আসলে কী ঘটেছিল

ইমদাদুল হক মিলন

এই বাড়ির কাজের লোকটির নাম বারেক।

তিরিশ-একত্রিশ বছর বয়স। এখনও বিয়ে করেনি। রোগা-পটকা-কেংলা রকমের। চেহারায় মিষ্টতা আছে, চোখ দু'টো সুন্দর। এক বালতি পানি এনে দরজার বাইরে একপাশে রাখল সে। সন্ধ্যা প্রায় হয়ে আসছে। তবু বালতি ভরা টলটলে পরিষ্কার পানিটা দেখতে পেলাম। বারেককে জিগ্যেস করলাম, এখানে এভাবে বালতি ভরা পানি রাখলে কেন?

বারেক কীরকম একটু রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসল। গ্রামের লোক হলেও কথা সে মোটামুটি শুদ্ধভাষায় বলে। শুধু দুয়েকটা শব্দের গণ্ডগোল হয়। বিক্রমপুরের মানুষ বলে এলাকার দুয়েকটা শব্দ শুদ্ধভাষার মধ্যে ঢুকে যায়।

এখনও ঢুকল। এমতেই রাখলাম।

বুঝলাম, 'এমতেই' মানে এমনি। বললাম, এমনি এমনি এক বালতি পানি সারারাত এখানে থাকবে?

বারেক আবারও সেই হাসিটা হাসল। থাকলে অসুবিধা কী? পানি অনেক দরকারি জিনিস। কত সময় কত কাজে লাগতে পারে। এই ধরেন রাত্রে আপনার পাও ধোয়ার দরকার হইল, হাতমুখ ধোয়ার দরকার হইল, তখন কষ্ট কইরা চাপকলের ওইখানে না গিয়া এই বালতির পানি দিয়াই কাজটা আপনে সারলেন।

আমার ওসবের দরকার হবে না। আমার ঘুম খুব গভীর। শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে যাই। একঘুমে রাত শেষ করি। সকাল সাতটার আগে ঘুম ভাঙে না।

নতুন জাগায় একটু অসুবিধা হইতে পারে।

কীসের অসুবিধা?

ঘুমের। অনেক মানুষ আছে জায়গা বদল করলে, বিছানা বদল করলে সহজে ঘুমাইতে পারে না। আপনে অনেকদিন পর নানার বাড়িতে বেড়াইতে আসছেন। এখানে ঢাকা শহরের মতোন ঘুম আপনের নাও হইতে পারে।

ঘরে ঢুকে পুরনো আমলের পালঙ্কে পা ঝুলিয়ে বসলাম।

আমার নানাবাড়ি গ্রাম এলাকার বিশাল বনেদি এক বাড়ি। বাইরের দিকে একতলা পুরনো একটা দালান। সেটাকে বলে কাছারিঘর। লোকজন এলে ওই ঘরে বসে। তারপর ভেতরবাড়ি। ভেতরবাড়ির চারদিকে চারটা বড় বড় টিনের ঘর। মাঝখানে মাঠের মতোন বিশাল উঠোন। পুনুখালা আর বাড়ির বহুকালের পুরনো ঝি রহিমা যে ঘরটায় থাকে, তার পাশেই রান্নাঘর। নানা নানী মারা যাওয়ার আগেই বিধবা হয়েছে পুনুখালা। তাঁর একটা মাত্র মেয়ে। সেই মেয়ে থাকে অস্ট্রেলিয়ায়। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই সিডনিতে ভাল চাকরি করে। আমার কোনও মামা নেই বলে মা আর পুনুখালা থাকেন এই বাড়িতে। দু-চার বছরে এক আধবার মা হয়তো আসেন। মা'র সঙ্গে আমিও এসেছি কয়েকবার। একা কয়েকদিন পুনুখালার কাছে থাকার জন্য এই প্রথম এলাম। আমার এমবিএ শেষ হয়েছে ক'দিন আগে। এখন কিছুদিন অলস

সময় কাটাব। তারপর চাকরি বাকরিতে ঢুকব। মা বললেন, যা তোর খালার কাছ থেকে বেড়িয়ে আয়। চলে এলাম।

এত বড় বাড়িটায় তিনজন মাত্র মানুষ। পুনুখালা রহিমা আর বারেক। আজ আমি এলাম বলে, লোক হয়েছে চারজন। দুপুরবেলা এসে পৌঁছাবার পর দিনমজুর ধরনের কয়েকজন পুরুষ মহিলা দেখেছি। তারা কেউ গোলাঘরের কাজ করছিল, উঠোনের রোদে ধান শুকিয়ে বস্তায় ভরছিল। কেউ কেউ কাজ করছিল বাড়ির পেছন দিককার সবজি বাগানে। বড় পুকুরটার পারেও আরেকটা সবজি বাগান, সেখানেও কাজ করছিল কয়েকজন। সন্ধ্যার আগে আগেই যে যার কাজ শেষ করে চলে গিয়েছে। এখন বাড়িটা একেবারেই নির্জন।

বিকেলবেলা বারেককে নিয়ে পুরো বাড়ি ঘুরে দেখতে দেখতে আমার মনে হয়েছে, বাড়িটা আসলে একটা খামারবাড়ি। ফা হাউজ। বনজ ফলজ আর ঔষধি গাছে ভর্তি। নানা প্রকারের সবজি ফলছে বাগানে পুকুরগুলো ভরে আছে মাছে। শুধু একটা জিনিসই নেই. গরু। বাড়িতে গরু নেই। পুনুখালা গরু পছন্দ করেন না। গোবরের গন্ধে তাঁর বমি আসে।

আমি আবার গরু খুব ভালবাসি। বাবার বন্ধু, আরেফিন আংকেলের একটা গরুর খামার আছে, ময়মনসিংহের ফুলপুরে। একবার সেই খামার দেখতে গিয়েছিলাম। গরুগুলোকে যা ভাল লেগেছে। সবচেয়ে ভাল লেগেছে গরুদের পানি খাওয়া দেখতে। গামলায় মুখ দিয়ে অদ্ভুত এক শব্দে পানি খাচ্ছিল। সেই শব্দটা এখনও কানে লেগে আছে।

আহা এই বাড়িতে যদি দুয়েকটা গরু থাকত তাহলে গরুদের পানি খাওয়াটা আবার দেখতে পেতাম। অন্তত সেই শব্দটা শুনতে পেতাম।

এই বাড়িতে পল্লীবিদ্যুৎ আছে। কিন্তু রাত ন'টার পর থাকে না। এজন্য সাড়ে আটটা পৌনে ন'টার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সবাই শুয়ে পড়ে।

আজও তাই হল।

পুনুখালা বললেন, তুই দক্ষিণের ঘরে থাক বাবা। ওই ঘরের পাল টা সুন্দর। তোর নানা শুতেন। নানার খাটে নাতি শুলে ঘুম ভাল হবে। বারেকও থাকবে তোর সঙ্গে।

আমার একা ঘরে ঘুমানোর অভ্যাস। বারেক সঙ্গে থাকবে শুনে একটু গাঁইগুঁই করলাম। আমি একাই থাকতে পারব খালা। বারেক অন্যঘরে ঘুমাক।

খালা বললেন, বারেক রোজ রাতেই ওই ঘরে ঘুমায়। ও ঘুমাবে মেঝেতে আর তুই পালঙ্কে। অসুবিধা কী? এত নির্জন বাড়ি, রাতে যদি ভয় পাস?

ভয় পাবে কেন?

ভূতের ভয় পেতে পারিস।

আমি ভূতে বিশ্বাস করি না। ভূতের ভয় আমার নেই। ঠিক আছে তুমি যখন বলছ বারেক থাক আমার সঙ্গে। অসুবিধা নেই।

পালঙ্কে উঠে বসেছি, বারেক মেঝেতে তার বিছানা মাত্র শেষ করেছে, পল্লীবিদ্যুৎ চলে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভরে গেল ঘর। বারেক বলল, দেখছেন অবস্থা? কীরকম অন্ধকার।

আমার ভালই লাগছে।

বলেন কী? এইরকম অন্ধকার আপনের ভাল লাগতেছে?

হ্যাঁ। কারণ আমি এখনই শুয়ে পড়ব, আর শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম। ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঘুম খুব জমে।

তয় জমাইয়া ঘুম দেন। রাত্রে যদি ঘুম ভা , যদি কোনও দরকার হয়, ডাইকেন আমারে।

মনে হয় দরকার হবে না।

বারেক কথা বলল না। মৃদু শব্দে হাসল।

শুয়ে পড়তে পড়তে বললাম, হাসছ কেন?

এমতেই হাসছি।

ঠিক আছে। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম বারেক। গুড নাইট।

বারেকও এসব আধুনিক কায়দা জানে। সেও বলল, গুড নাইট।

রাতদুপুরে ঘুম ভেঙে গেল। ঘুমের ভেতর থেকেই কীরকম একটা শব্দ পাচ্ছিলাম, অচেনা একটা গন্ধ এসে লাগছিল নাকে। ঘুম ভাঙার পর টের পেলাম, শব্দটা আসছে দরজার বাইরে থেকে। চরচর, চরচর এইরকম শব্দ। কোনও একটা জন্তু যেন পানি খাচ্ছে।

কয়েকটা মাত্র মুহূর্ত, শব্দটা চিনে ফেললাম। আরে, এ তো গরুর পানি খাওয়ার শব্দ! আরেফিন আংকেলের ফুলপুরের খামারে গরুদের পানি খাওয়ার শব্দ পরিষ্কার মনে আছে আমার। ঠিক এইরকম শব্দ। গ টা চিনতেও দেরি হল না। গরুর গায়ের গন্ধ। দরজার বাইরে বালতিতে যে পানি সন্ধ্যাবেলা রেখেছিল বারেক, সেই পানি গরুতে খাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে খাচ্ছে। খাওয়া যেন থামছেই না।

কিন্তু এই বাড়িতে তো গরু নেই। গরু নামের জন্তুটা দুই চোখে দেখতে পারেন না পুনুখালা। গোবরের গন্ধে তাঁর বমি আসে। তাহলে এত রাতে কোত্থেকে এল গরু? কাদের গরু এত রাতে এই বাড়িতে এসে বারেকের রাখা বালতিভরা পানি খাচ্ছে? তাছাড়া গরু খুবই দামি প্রাণী। গৃহস্থরা গরু খুবই যত্নে গোয়ালঘরে বেঁধে রাখে রাত্রে। কেউ কেউ রাত জেগে পাহারা দেয়। গরুচোরের অভাব নেই দেশগ্রামে। শুনেছি চান্স পেলেই গৃহস্থের গোয়াল থেকে গরুচুরি করে গ্রামের হাট বাজারে বিক্রি করে দেয় গরুচোরগুলো। কসাইদের কাছে বিক্রি করে দেয়, যাতে মুহূর্তেই চামড়া বিক্রি হয়ে যায় ট্যানারিওলাদের কাছে, কেজি দরে মাংস বিক্রি হয়ে যায় খদ্দেরদের কাছে। বিক্রমপুর এলাকায় গরুর নাড়িভুড়িকে বলে 'আতড়ি উঝুড়ি'। সেই জিনিসও পরিষ্কার করে, তেল মশলা দিয়ে রান্না করে খায় অনেকে। খুবই নাকি টেস্টি জিনিস। গরুর হাড়মাথাও আজকাল ফেলনা জিনিস না। টোকাইরা কুড়িয়ে নিয়ে হাড্ডিওলাদের কাছে বিক্রি করে দেয়। সেই জিনিস চালান হয়ে যায় বিদেশে। গরুর হাড্ডি শুকিয়ে পাউডার করে সেই পাউডার থেকে তৈরি হয় সিরামিকসের প্লেট পেয়ালা। আর দুধ এবং মাংসের জন্য গরু, হালচাষের জন্য গরু, সবমিলিয়ে গরু হচ্ছে অপরিসীম প্রয়োজনীয় এক প্রাণী। এইরকম প্রয়োজনীয় দামি প্রাণী, কোন বাড়ির গোয়াল থেকে ছুটে এসে রাতদুপুরে আমার নানাবাড়ির পানি খাচ্ছে?

গরুর পানি খাওয়ার শব্দটা তখনও সমানে চলছে। শব্দের সঙ্গে গায়ের গন্ধটাও ঘরে এসে ঢুকছে। একটু যেন

গোবরের গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে। তার মানে পানি খাওয়ার ফাঁকে ওই কাজটাও সেরে নিচ্ছে গরুটা।

ইস পুনুখালা নিশ্চয় সকালবেলা খুব বিরক্ত হবেন। গোবরের গন্ধে তাঁর বমি হয়ে যেতে পারে।

আস্তে করে বারেককে ডাকলাম। বারেক।

বারেক সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল। জি।

তার মানে গরুর পানি খাওয়ার শব্দে বারেকেরও ঘুম ভেঙে গিয়েছে।

শুনতে পাচ্ছ?

জি পাইতেছি।

এত রাত্রে গরু এল কোত্থেকে? কাদের বাড়ির গরু এসে বালতির পানি খেয়ে যাচ্ছে। গোবরের গন্ধও পাচ্ছি। আমরা কি উঠব? দু'জনে মিলে গরুটা তাড়াব?

বারেক ভয়ার্ত গলায় বলল, আপনের কি মাথা খারাপ হইছে? চুপচাপ শুইয়া থাকেন। কথাও বইলেন না।

কেন?

সকালবেলা ঘটনা আপনেরে বলব।

আমাদের কথাবার্তার শব্দেই কি না কে জানে, হঠাৎ পানি খাওয়ার শব্দটা বন্ধ হল, আর পানির বালতিটা যেন উল্টে পড়ল। গরুটাও যেন দৌড়ে চলে গেল। তার ভারি শরীরের দৌড়ে মৃদু একটা কাঁপন লাগল মাটিতে, পালঙ্কে শুয়েও সেটা টের পেলাম আমি। বাড়ির পাশ দিয়ে ট্রেন কিংবা ভারি ট্রাক চলে গেলে মাটি যেমন কাঁপে ঠিক তেমন করে কাঁপল পালঙ্ক।

সকালবেলা আমাকে ডেকে তুলল বারেক। ওঠেন ওঠেন, মজার একটা কারবার দেখাই আপনেরে।

উঠলাম। বারেকের সঙ্গে দরজা খুলে বেরুলাম।

বারেক বলল, দেখেন, বালতির দিকে চাইয়া দেখেন।

ঘুম ভাঙা চোখে বালতির দিকে তাকালাম। তাকিয়ে বড় রকমের একটা ধাক্কা খেলাম। চোখ কচলে আবার তাকালাম। না, দৃশ্য বদলায়নি। দৃশ্য একই বালতিভরা পানি ঠিকই আছে। এক ফোঁটাও কমেনি বারেক যেভাবে রেখেছিল ঠিক সেইভাবে আছে বালতি, সেইভাবেই আছে পানি। মাঝরাতে গরুতে তাহলে খেল কী? এতক্ষণ ধরে পানি খাওয়ার শব্দ পেলাম, এই নিয়ে বারেকের সঙ্গে কথা বললাম। আমাদের কথাবার্তার শব্দে বালতি উল্টে দিয়ে ছুটে গেল গরুটা, সেই শব্দও পেলাম। আর এখন দেখছি সবই ঠিক আছে। বালতি আছে বালতির জায়গায়, পানি ভরা আছে আগের মতোই। ব্যাপার কী?

আমি তারপর গোবর খুঁজলাম। গোবরের গন্ধ যে পেয়েছিলাম, সেই বস্তুটাই বা উধাও হয়ে গেল কোথায়? কোনও চিহ্নই তো নেই।

কাল সন্ধ্যার সেই রহস্যময় হাসিটা হাসল বারেক। বুঝলেন কিছু?

ফ্যালফ্যাল করে বারেকের দিকে তাকালাম। মাথা নাড়লাম। না, কিছুই বুঝলাম না। সবই দেখি ঠিক আছে। মাঝরাতে অতক্ষণ ধরে গরুটায় তাহলে খেল কী? শব্দ পেলাম, গরুর গায়ের গন্ধ, গোবরের গন্ধ সবই পেলাম। দৌড়ে চলে যাওয়ার শব্দও পেলাম। আর এখন দেখি বালতিভরা পানি যেমন ছিল তেমনই আছে! গোবরের চিহ্নও নেই!

কোথা থেকে থাকবে? গরু বলে কোনও জিনিস তো আসে নাই।

তাহলে কী এসেছিল? বারেক, তুমি আমার সঙ্গে ফাজলামো করো না। গরুর পানি খাওয়ার শব্দ আমার চেনা গা এবং গোবর দু'টোর গন্ধই চেনা। বালতি উল্টে দৌড়ে চলে যাওয়ার শব্দ আমি পেয়েছি। তুমিও পেয়েছ। এত কিছুর পর বলছ গরু বলে কোনও জিনিস আসেনি। তাহলে কী এসেছিল? আমার মনে হয় তুমি কিছু একটা চালাকি করেছ।

বারেক বিস্মিত চোখে তাকাল। আমি কী চালাকি করব?

নিশ্চয় আমার ঘুম ভাঙার আগে উঠে চাপকল থেকে বালতি ভরে পানি এনে রেখেছ, গোবর পরিষ্কার করে রেখেছ।

সেইটা কইরা আমার লাভ কী? দরজা খুইলা ঘর থেকে বাহির হইলে সেই আওয়াজ আপনে পাইতেন। চাপকল থেকে ঘুটঘুটে অন্ধকারে কেন এত কষ্ট করে পানি আনতে যাব আমি? অন্ধকারে গোবরই বা পরিষ্কার করব কীভাবে? রাত্রে এই কাজগুলি সারবার কোনও দরকার নাই। দরকার থাকলে সকালবেলা সারব। আমারে তো কেউ তাড়া দেয় নাই।

বারেকের কথায় যুক্তি আছে। ঠিকই তো। বারেক কেন অন্ধকার রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসব কাজ সারতে যাবে? কাজটা তো এমন কিছু জরুরি না।

বললাম, তাহলে ব্যাপারটা কী?

বারেক গম্ভীর গলায় আবার সেই কথাটা বলল। গরু বলে কোনও জিনিস আসে নাই।

তাহলে কী এসেছিল?

আপনে বোঝেন নাই?

না।

এত সহজ জিনিসটা বুঝতাছেন না?

এবার গা কাঁটা দিয়ে উঠল আমার। গলা কেমন শুকিয়ে এল। ঢোক গিলে বারেকের দিকে তাকালাম।

বারেক বলল, যদি সত্য সত্যই গরু হইত তাহলে আপনের কথায় আমি রাজি হইতাম। দুইজনে বাহির হইয়া গরুটা তখনই তাড়ায় দিতাম। আমার হাতের কাছে ম্যাচ থাকে, হ্যারিকেন থাকে। হ্যারিকেন জ্বালাইয়া দুইজনে বাহির হইলে গরু তাড়ানো কঠিন কোনও কাজ ছিল না। আর একটা কথা হইল, এই বাড়িতে গরু নাই, গরু ঢুকবারও কোনও পথ নাই। বাড়ির চারদিকে কাঁটাতারের বেড়া। নানান পদের সবজির চাষ হয় বাড়িতে। গরু, ছাগল ঢুকলে ক্ষেতের সবজি বিনাশ কইরা ফালাইব। সামনের দিককার গেটটাও রাত্রে বন্ধ করি আমি নিজহাতে। তাহলে গরু আসবে কোথা থেকে?

শুকনো গলায় বললাম, তাহলে কী এসেছিল?

যে এসেছিল সে মাঝে মাঝেই আসে। কোনও রাতে আমি টের পাই, কোনও রাতে পাই না। তবে সে পানি খাইতে খুবই ভালবাসে। আর তিনাদের পানি খাওয়া আজব রকমের। পানি খাইবেন ঠিকই কিন্তু সেই পানি ফুরাইব না। তিনার জন্য পানি আমি রোজ সন্ধ্যাবেলাই দরজার বাইরে রাইখা দেই। কোন রাত্রে তিনি আসবেন, কোন রাত্রে পানি খাবেন। যদি মুখের কাছে পানি না পান, তাহলে আমার উপরে চেইতা যাইবেন। আমি একলা এইঘরে থাকি। যদি ঘরে ঢুইকা...। ঘরে ঢুকবার জন্য তিনাদের কোনও দরজা লাগে না। হাওয়ার সঙ্গে ঢুকবেন, হাওয়ার সঙ্গে বাহির হইবেন।

ভয়াত গলায় বললাম, ঘটনাটা কি খালা জানেন? রহিমা বুয়া জানে?

না, কেউ জানে না। আমি কাউরে বলি না। বললে যদি আমার উপরে তিনি চেইতা যান? ভাইজান, আপনেও কেউরে বইলেন না।

ছবি তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

/

আ
আষাঢ়ে

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

অশরীরী!

আমার বন্ধু কানাইলাল দত্তর বাড়িতে ফি রবিবারে তাসাড্ডা হয়। আমি মাঝে মাঝে যাই। গত রবিবার দুপুরে বৃষ্টি নামল, থামবার নাম নেই। চা-মুড়ি হয়ে গিয়েছে। নিজেই বানায় কানাই। ও ব্যাচেলার। গর্তকে বড় ভয় ওর। বৃষ্টি বেড়ে যেতেই ঘরের গর্তগুলিকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল কানাই দত্ত। কোথাও ইট চাপা দিল, কোথাও পুরনো ন্যাকড়া ঠেসে দিতে লাগল। গড়াইবাবু হেঁকে উঠলেন—কী কচ্ছেনটা কী কানাইবাবু...কানাই যেন কোনও অন্যায় করছে। কানাই অবাক তাকায়। বলে বিষ্টি হলে বাইরের বিছে পোকাটোকা ঢুকে যায় যে...। গড়াইবাবু বল্লেন আমি কিন্তু কক্ষনও আমার বাড়ির নর্দমার মুখ বন্ধ করি না। ও বেচারার খুব অসুবিধে হয়।

কোন বেচারা!

ভূত। নর্দমা ভূত। আমাদের বাড়ির নর্দমায় থাকত। এখন নেই। আমার ভুলেই নেই। তবে নর্দমার মুখ বন্ধ করি না। পাছে আসতে অসুবিধা হয়।

আমরা গড়াইবাবুর মুখের দিকে অবাক তাকাই। এই ঠেক-এ গড়াইবাবু নতুন আমদানি। ওঁর ঘোড়ার কারবার—কাঠের রক অ্যান্ড রোল ঘোড়া। কানাই ঘোড়ার ডাক সাপ্লাই করে। টিপলেই চিঁ হি হি শব্দ। এই ঘোড়া সূত্রেই কানাইয়ের সঙ্গে গড়াইয়ের আলাপ।

গড়াইয়েরও বউ নেই। ছিল, চলে গিয়েছে। আর বউহীনতার কারণেই বন্ধুত্ব। গড়াইবাবু ঘাড়ে-গর্দানে। মধ্যদেশও বেশ বড়। কানাই দত্ত রোগা মানুষ। বর্তমানে গ্যাস্ট্রিকের রোগী। মদ্যপান দু'জনেরই প্রিয়। কিন্তু ডাক্তারের নির্দেশে কানাইয়ের মদ্যপান বন্ধ। কানাই তবু গোপনে চালিয়ে যাচ্ছে। কানাইয়ের ছোট বোন কাছেই থাকে। মাঝে মাঝে সারপ্রাইজ চেকিংয়ে আসে। ফ্রিজ, খাটের তলা ইত্যাদি সম্ভাব্যস্থান চেক হয়। কানাইকে এজন্য কল্পনাপ্রবণ হয়ে নব নব স্থান আবিষ্কার করতে হয়। কানাইয়ের বোনও অধিকতর পারদর্শীতায় শরৎ রচনাবলির পিছন থেকে একটা চ্যাপ্টা শিশি উদ্ধার করে

গড়াই জানালার দিকে তাকিয়ে বৃষ্টির প্রাবল্য বুঝতে চেষ্টা করেন। আমি বলি, আপনার নর্দমা ভূতটার কথা একটু ডিটেল-এ বলুন, শুনি। গড়াই হাসলেন। বললেন ও কি আর এমনি হবে? কানাই ইঙ্গিতটা বুঝল। বলল, বাইরে তো ভালই বৃষ্টি মনে হচ্ছে। আজ সারপ্রাইজ ভিজিটের চান্স নেই। একটা এমার্জেন্সি স্টক আছে, দেখছি। কানাই একটা বোতল নিয়ে এল বাথরুমের কমোডের সিস্টার্নের ভিতর থেকে। খোলা হল। বাইরে বৃষ্টি, হু-হু হাওয়া, ঘরে হুইস্কি। একটা লম্বা চুমুক দিলেন গড়াইবাবু। বললেন—আমি তো বাঙ্গুরে থাকি, জানেন তো। যেখানে বৃষ্টি হলেই জল জমে। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মশাই একটা কবিতা লিখেছিলেন 'হ্যালো দমদম'—ওই জল নিয়েই না?

আমি মাথা নাড়ি। চুমুকও মারি। গড়াইবাবু বলতে থাকলেন—আমি তখন বাঙ্গুরে নতুন। একতলার ফ্ল্যাট। বর্ষাকাল। নিম্নচাপের বৃষ্টি। প্যানপ্যান করে সারাদিনই চলছে। কাজ কারবার বন্ধ। টিভি দেখছি আর মাল খাচ্ছি। ওয়েদার ফোরকাস্ট দেখেই স্টক করে রেখেছিলাম।

রান্নার লোকটাও আসেনি। নিজেকেই খাবার বানিয়ে নিতে হবে। বিগ গেলাসে একটা স্মল সিপ দিয়ে খিচুড়ি বানাতে রান্নাঘরে গিয়েছি, চাল ডাল ভিজিয়ে আর একটা সিপ মারতে এসে দেখি গেলাসের হাফ শেষ। কে খেলো? ঘরে তো টিকটিকি ছাড়া কেউ নেই। উবে তো যেতে পারে না। ভাবলাম, আগের বার নেশার ঝোঁকে বেশি টেনে নিয়েছিলাম হয়তো। আবার ছোট এক সিপ মারলাম। ওয়ান থার্ড গেলাস তখন ফুল। কিচেনে গিয়ে পেঁয়াজটা কুচিয়ে আবার ঘরে এলাম। কী বলব মাইরি। গেলাস ফাঁকা।

এরপর আমি আবার ঢাললাম গেলাসে। গেলাসটা হাতে করে রান্নাঘরে গেলাম। প্রেশার কুকারে খিচুড়ি বসালাম আর চুকচুক করে খেতে লাগলাম। কই, নিজে থেকে তো উবে গেল না। কিন্তু একটু আগে যে উবে গেল? একদম বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না-গোছের ব্যাপার।

যাই হোক। রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর শুয়ে পড়লাম। বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। ব্যাঙের ডাকে শুনতে পেলাম আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদর দিনে। সকালে উঠে দেখি, ঘরের ভিতরে জল। কী আর করব, সবার যা হবে আমারও তাই হবে। কিছু জিনিসপত্র খাটের উপর রাখলাম। নর্দমার গর্ত দিয়ে জল ঢুকছে। ওখানে একটা ইট রাখলাম। ইটে কী হবে। খাটের উপর নানা জিনিস, যা খাটে থাকার যোগ্য নয়। যেমন জুতো। ওরই মধ্যে বোতল বার করলাম, গ্লাসে ঢাললাম। কিন্তু জল ঢালতে গিয়ে গ্লাসটাই জলে পড়ে গেল। যে নর্দমার মুখ দিয়ে জল ঢুকছিল, সেই নর্দমা দিয়েই হুড়হুড় করে জল বেরিয়ে যেতে লাগল। আমি অবাক হয়ে দেখছি নর্দমার মুখ চোঁ-চোঁ করে মাল মেশানো জল টেনে নিচ্ছে। ঘর থেকে জল বেরিয়ে গেল।

কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার জল ঢুকতে লাগল। আবার হুইস্কি ঢাললাম জলে। নর্দমা টেনে নিল। এমনি করে সেদিন আমার দশ পেগ হুইস্কি জলে গেল। সরি, ভূতের পেটে গেল। নর্দমা ভূত।

তারপর এক আজব কাণ্ড। এই নর্দমায় ভুকভুক তো ওই নর্দমায় বুটবুটি। এখানে বাবলিং তো ওখানে খাবলিং। বুঝলাম, দশ পেগ সহ্য হয়নি। ভূত মাতলামি করছে।

তারপর যা হোক, সেবারের মতো নিম্নচাপ তো সরল। আমি কয়েক পেগ খরচ করে আমার ঘরের জলটা অন্যদের আগেই সরিয়ে নিলাম। নর্দমা ভূতের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এরপর ওর সঙ্গে মাল খেতাম। একটা গেলাসে ওর জন্য ঢালতাম, আর একটায় আমার জন্য। আমিও শেষ করতাম, আর ওই গেলাসটাও শেষ হত। আলাদা প্লেটে চিপস-চানাচুর দিয়ে দেখেছি, অ্যাজ ইট ইজ থেকে গিয়েছে। ও বোধ হয় নর্দমা থেকেই চাট নিয়ে নেয়।

ইতিমধ্যে গড়াইয়ের গেলাস শেষ। আমিই আর একটু গড়িয়ে দিলাম। বললাম তা হলে তো ভালই আছেন। আপনার বাড়ির নর্দমা জ্যাম হয় না, ভূতই সাফাই করে দেয়।

রাইট ইউ আর। নর্দমা নিয়ে আমাকে কক্ষনও সমস্যায় পড়তে হত না। বাড়ির অন্যদের ড্রেন জ্যাম হলেও আমার হত না। আর এজন্য আমাকে ইনভেস্ট

করতে হত। খরচা একটু বেশিই পড়ত। তবে এমনও হয়েছে, খরচা বাঁচাবার জন্য আমি নিজের গেলাসে বিলিতি আর বন্ধুর গেলাসে দিশি ঢেলেছি, কোনও অসুবিধে হয়নি।

আমি বলি. বরং দেশিটাই প্রেফার করবে ও। নর্দমায় থাকে কি না, আমাদের নর্দমা সাফাইওলাদের দেখেন না, দেশি খায়।

গড়াই বলেন এগেন রাইট ইউ আর। ও তো আগে তাই ছিল। কয়েক বছর আগে প্রচুর চুল্লু খেয়ে একটি সাফাইকর্মী হাইড্রেন পরিষ্কার করতে নেমেছিল। সে না কি ওখানেই মারা যায়। শোনা কথা। আমি তো ও পাড়ায় নতুন গেসলাম। তবে আমি ওকে চুল্লু টুল্লু অফার করিনি। চুল্লুতে অনেক সময় পয়জনিং হয়। রিস্ক নেব কেন?

মানুষ মরে ভূত হয়। ভূত মরে কী হয়, কে জানে। যদি আবার মানুষ হয়, তো ঝামেলার শেষ নেই। গড়াইয়ের গেলাস শেষ। বোতল থেকে আবার গড়াই। বৃষ্টি ঝরেই চলেছে। গড়াই বলল এতক্ষণে নির্ঘাৎ ঘরে জল ঢুকে গিয়েছে। আমি বলি, আপনার আবার চিন্তা কী? আপনার তো পোষা ভূত আছে।

গড়াইবাবু বলেন, ও থাকতে তো চিন্তাই ছিল না। বললাম না, আমার একটা ভুলের জন্যই ও নেই। আমার ফ্ল্যাট পাল্টাতে হবে।

কোথায় গেল ও? আমি জিজ্ঞাসা করি।

—অন্য কোথা। অন্য কোনওখানে।

—কেন?

—ডিউ টু মাই মিসটেক! আমি ভুল করেছিলাম।

ব্যাপারটা খুলেই বলি। মাস তিনেক আগে কালবৈশাখির বৃষ্টি হল চারঘণ্টা ধরে, মনে আছে? সেই বৃষ্টিতে ঘরে অল্প অল্প জল ঢুকতে শুরু করেছে, আমি তখন নর্দমার মুখে দু'পেগ মতো রাম ঢেলে দিলাম। অন্য কিছু ছিল না। জেনারেলি রাম খাইনা আমি। কিন্তু সেদিন পাড়ার দোকানটায় অন্য কিছু পাইনি। পরের দিন বাংলা বন্ধ বলে সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। অগত্যা রাম। এবং তারপরই ভূত পালিয়ে গেল। আমাদের শাস্ত্র, প্রবাদ-প্রবচন একদিনে হয়নি। বহু এক্সপেরিমেন্টের পর এসব হয়েছে। রাম নাম করলে ভূত পালায়—এমনি এমনি বলেনি। রামের ছোঁয়া লাগলেও যে ভূত পালাবে—এটা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।

লম্বা চুমুক মারলেন গড়াইবাবু।

আ
আষাঢ়ে

রবিশংকর বল

এক একটা শহর থাকে, দেখে মনে হয় যেন কারবালা। বাড়িঘর, দোকানপাট, যেদিকেই তাকাও, শুধু সমাধিস্তম্ভরা দাঁড়িয়ে আছে। এখানকার মানুষজন মাথা নিচু করে এমনভাবে হাঁটে, মনে হবে, তারা যেন ঘন কুয়াশা ভেদ করে এগিয়ে চলেছে। নিশাপুর শহরটা যে এমনই গোরস্থানের মতো হয়ে গিয়েছে, তা আমি জানতাম না। শহর কখন এইরকম হয়ে যায়? আমার দাদু বলত, 'শহর বাড়তে বাড়তে যখন আকাশ ছুঁতে চায়, তখনই জানবি, তার এন্তেকাল ঘনিয়ে এসেছে।' আমাদের শহরটাও যেন সেই পথেই এগিয়ে চলেছে, যত উঁচু উঁচু বাড়ি আর দোকানপাট তৈরি হচ্ছে, ততই চারদিকে ঘন কালো ধোঁয়া দেখতে পাই আমি। হাকিম জামি নামে একজনকে চিনত দাদু। জামি নাকি বলতেন, 'রোজ যদি কাচি দিয়ে দাড়ি না কাটো, তাহলে একদিন দেখবে, দাড়ি বেড়ে বেড়ে এমন হয়েছে যে দাড়িকেই মনে হবে মাথা।' বলতে বলতে হা হা করে হাসতেন জামি।

নিশাপুর শহর সম্পর্কে আমার একরকম স্বপ্ন ছিল। দাদুর কাছে অনেক আগে শুনেছিলাম, নিশাপুর সারাদিন সূর্যের আলোয় ঝলমল করে; আর পূর্ণিমার আলোয় নাকি মনে হয়, আকাশে একটা কার্পেটের ওপর ভেসে আছে শহরটা। কিন্তু শহরটাকে দেখে আমার স্বপ্ন ভেঙে গেল, এখানকার ভাঙাচোরা, ধূলিধূসর রাস্তাগুলো যেন একদিন মরুভূমি হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় ঝিমোচ্ছে। গভীর এক শীতঘুমের ভিতরে ঢুকে গিয়েছে নিশাপুর। কবে আবার সে জেগে উঠবে? জেগে উঠবে কি কখনও? পৃথিবীর কোনও মৃতশহর কি আবার কখনও জেগে উঠেছে? না হলে পৃথিবী জুড়ে এত ধ্বংসস্তূপ, এত হারিয়ে যাওয়া শহর কেন ছড়িয়ে আছে?

তবু নিশাপুর এখনও হারিয়ে যায়নি। আর আমাকে সেই দারুখানা খুঁজে বার করতেই হবে। দারুখানাটির খোঁজেই আমি এ শহরে এসেছি। আসলে দারুখানাও নয়, এসেছি একটা বিশেষ আতরের খোঁজে। আমার দাদু ওই আতর ব্যবহার করত। সেই আতরের গন্ধে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটত—আমাদের বাড়িটা পাখির কিচিরমিচিরে ভরে যেত। না, বাড়িতে আমাদের পাখি ছিল না, ছোটবেলায় দু'একটা ময়ূর, কাকাতুয়া বাড়িতে দেখেছি; কিন্তু আমি একটু বড় হতেই তারা মরে গিয়েছিল। তবু স্নান করে এসে দাদু যখনই আতর লাগাত, তখনই শুরু হয়ে যেত পাখিদের কলরব, আতরের গন্ধ যত ঝিমিয়ে আসত, পাখিদের কলকাকলিও ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেত। দাদু মারা যাওয়ার পর পাখিদের কিচিরমিচির আর আমাদের বাড়িতে শোনা যায়নি। কেননা আমাদের বাড়িতে দাদু ছাড়া ওই আতর আর কেউ মাখত না, আসলে মাখবার সুযোগও ছিল না, দাদুর কোনও গোপন বাক্সে রাখা থাকত সেই আতর।

দাদুর মৃত্যুর পর বাক্সটি আমি খুঁজে পাই তার লাইব্রেরিতে। অনেক বইয়ের পিছনে লুকনো ছিল সেই বাক্স। অপূর্ব পাখি-লতা-পাতা-ফুলের কারুকাজ করা ছোট একটি কাঠের বাক্সের ভিতরে নীল রংয়ের কাচের শিশি; ওটা দেখে আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কেন

যে দু'চোখ ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। নিশাপুর আসার পর জেনেছি, প্রাচীন পারস্যে নীল রং ছিল শোক আর বিষণ্ণতার রং। কবি ফিরদৌসি নাকি সে কথাই লিখে গিয়েছেন। কিন্তু তখন তো আমি তা জানতাম না। তাহলে কি আতরের সুগন্ধ এক গভীর বিষণ্ণতা? তাই যদি হবে, ওই আতরের গন্ধ ছড়িয়ে পড়লেই আমাদের বাড়ি পাখির আওয়াজে ভরে উঠত কেন? এর উত্তর আমি কোনওদিনই জানতে পারব না; দাদু বেঁচে থাকলে হয়তো বলতে পারত।

নীল রংয়ের শিশিতে একটুও আতর অবশিষ্ট ছিল না। মৃত্যুর আগে পুরো শিশিটাই শূন্য করে রেখে গিয়েছিল দাদু; তার একান্ত আতর, আর কারওর জন্য রেখে যেতে চায়নি দাদু। শুধু সেই আতরের গন্ধ আর পাখিদের কিচিরমিচির আমার স্মৃতিতে রেখে গিয়েছে। বাক্সের ভিতরেই একটা হলুদ হয়ে যাওয়া কাগজে দাদু লিখে রেখে গিয়েছিল আতর ও আতরওয়ালার নাম, কোথায় পাওয়া যায় এই আতর। আতরের নাম 'মনতেক অত-তয়র'। আতরওয়ালার নাম ফরিদউদ্দীন আতর। আতরের ঠিকানা দারুখানা, নিশাপুর।

কিন্তু নিশাপুর কোথায়? এ দেশের কোন রাজ্যে? কোন জেলায়? নাকি এ দেশের বাইরে? বুঝলাম, জাহিরের সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার। আমার বন্ধু জাহির ভূগোলের খুব ভাল ছাত্র। আমার সব কথা শুনে জাহির হাসিতে ফেটে পড়ল।

—তোর দাদু বেড়ে মজা করে গেছেন দেখছি।

—কেন?

—নিশাপুর কি এখানে?

—তবে কোথায়?

—ইরানে। ইরানের উত্তর-পূর্ব দিকে। ওমর খৈয়াম নিশাপুরেই জন্মেছিলেন।

এরপর জাহিরকে আর কীই বা জিগ্যেস করা যায়? কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম, দিনে দিনে দাদুর ওই আতরের প্রতি আমার ভিতরে একটা টান তৈরি হচ্ছে। তার একটা বড় কারণ হয়তো, ওই আতরের খুশবু ছড়িয়ে পড়লেই আবার এই বাড়িতে পাখিদের কলরব শুনতে পাওয়া যাবে। দাদুর লাইব্রেরিতে গিয়ে রোজই বাক্সটা খুলি, আতরের নীল শিশিটা বার করি, শিশির মুখ খুলে গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করি, কিন্তু এক ফোঁটা গন্ধ নেই; দাদু একটা নিঃস্ব আতরের শিশি আমার জন্য রেখে গিয়েছে।

দাদুর লাইব্রেরিতেই আমার বেশিরভাগ সময় কেটে যায়; তার রেখে যাওয়া বইপত্রের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে; কখনও তার ডায়েরি, ফেলে যাওয়া টুকরো কাগজপত্তর দেখে। আমার সামনে টেবিলের ওপর বসানো থাকে ছোট কাঠের বাক্সটি; আমি মাঝে মাঝে নীল আতরের শিশি বার করে দেখি। কান পেতে শোনার চেষ্টা করি, কোনও পাখির ডাক শোনা যায় কি না।

একদিন রাতে দাদুকে স্বপ্নে দেখলাম। লাইব্রেরি ঘরেই টেবিলের এপারে-ওপারে মুখোমুখি বসে আছি আমরা। দাদু আতরের শিশিটা হাতে নিয়ে লোফালুফি খেলছে। একসময় আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মৃত্যু এসে একদিন সব গন্ধ মুছে দিয়ে যায়।'

—তারপর কী থাকে দাদু?

—একটা আয়না।

—কোন আয়না?

—যে আয়নাতে সব কিছু দেখা যায়। তাকে তুই কখনও সামনাসামনি দেখতে পাবি না, সহ্যই করতে পারবি না সেই রূপ। তাকে দেখতে হয় আয়নার মধ্য দিয়ে।

—সে কে?

—নিশাপুর।

—তোমার আতরের শহর?

—নিশাপুরকে আয়নার ভিতরে দেখতে হয়। সেই শহর কখনও জন্মায়নি, কখনও মরবেও না। সেই শহরে সবকিছুই আছে, আবার কিছুই নেই। সেই শহরে আতরের জন্ম; সেই শহর আবার কারবালাও।

দাদু আমার হাতে নীল শিশিটা দিয়ে বলল, 'একবার খুঁজে দেখ। পেয়েও যেতে পারিস। মনে রাখিস, নিশাপুর শুধু আয়নার ভিতরেই থাকে।'

শেষ পর্যন্ত নিশাপুরে এসে যে পৌঁছতে পেরেছি, এই যথেষ্ট। কীভাবে এলাম, জানি না। হয়তো দাদুর কথাই ঠিক যে, আমি আসলে একটা আয়নার সামনেই দাঁড়িয়ে আছি, যার ভিতরে জেগে আছে নিশাপুর। আর শহরের পথে খুঁজে চলেছি সেই দারুখানা, যেখানে আমার দাদুর ব্যবহার করা আতর পাওয়া যেত। নিশাপুরে এসে জেনেছি, দারুখানাতে শুধু আতরই পাওয়া যায় না, নানারকম ওষুধও পাওয়া যায়, এখনকারদিনে আমরা যাকে কেমিস্ট'স শপ বলি।

বেশ কয়েকদিন কেটে গেল দারুখানার খোঁজে যেখানে ফরিদউদ্দীন আতর তাঁর তৈরি ওষুধ ও আতর বিক্রি করতেন। কিন্তু আতরসাবের কথা কেউই বলতে পারল না। একদিন হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে বিকেলবেলা একটা দরগার সামনে বসে পড়েছি। একজন দস্তানগোকে ঘিরে বেশ ভিড় জমেছে। দস্তানগো মানে যারা এখানে-ওখানে ঘুরে ঘুরে নানা কিসসা শোনায়। বেশ মজার একটা কিসসা শোনাচ্ছিল সে।

সে অনেকদিন আগের কথা। ধরো না কেন, সেই যখন সোলয়মানের কাছে তাঁর হোদ্‌হোদ্ পাখি সবা নগরীর রানি বিলকিসের খবর নিয়ে এসেছিল। তখন এক ছুতোরের নাম ছিল নজর বিন ইউসুফ। ছুতোরের কাজের বাইরে বেশিরভাগ সময় সে পুরনো সব পুঁথি পড়ে দিন কাটাত। সে সব পুঁথিতে এমন সব কথা লেখা ছিল, যা আমরা এখন ভুলেই গিয়েছি। এসব পড়েই ইউসুফ জেনেছিল, বুড়ো হয়ে যাওয়ার পরেও আবার কী করে যৌবন ফিরে পেতে হয়। একদিন সে তার চাকরকে ডেকে কী বলল জান?

—কী?

—সে বড় গোপন কথা।

—বলই না, সে কেমন গোপন কথা!

—সে আবার নতুন জীবন ফিরে পেতে চায়।

—তা কি পাওয়া যায়?

—তাই বলে কি আর মানুষ চায় না? ইউসুফেরই বা চাইতে দোষ কী? সে তার চাকরকে ডেকে বলল, শোন নতুন জীবন পেয়ে কীভাবে অমর হতে হয় আমি

জেনে গিয়েছি। তুই আমাকে একটু সাহায্য কর বাপু। একা একা তো আমি এ কাজ পারব না। চাকর শুধোয়, কী করতে হবে বাপ আমার? ইউসুফ বলে, তুই আমাকে তরোয়াল দিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটবি। এই কাঠের পিপের মধ্যে নানারকম ওষুধ আছে। তার মধ্যে আমার শরীরের টুকরোগুলো ফেলে পিপের মুখটা বন্ধ করে দিবি।

—তারপর?

—চাকর তো কিছুতেই রাজি হয় না। সে আমি পারব না হুজুর। আপনাকে আমি কিছুতেই কাটতে পারব না। শেষে প্রভুর আদেশ মানতেই হল। ইউসুফ মরার আগে বলে গেল, আটাশদিন পরে পিপের মুখ খুলে দিবি। তাহলেই আমি আবার যৌবন নিয়ে ফিরে আসব।

—ফিরে এল?

—দস্তান শুনবে, তাতে এত অধৈর্য হও কেন? ধৈর্য যদি না থাকে বিবির কাপড় কাচো গে যাও, দস্তান শুনতে হবে না। এদিকে তো রোজই নানা জন এসে ছুতোরের খোঁজ করে, 'ইউসুফ মিঞা কোথায়? তাকে দেখছি না কেন?' চাকর বলে, 'মিঞা তো একটু কাজে বাইরে গিয়েছেন। কয়েকদিন বাদেই ফিরবেন।'

শেষে তো দারোগা-পেয়াদা এসে হাজির। তাদের সন্দেহ চাকরটাই মনিবের কোনও ক্ষতি করেছে। সারা বাড়ি খুঁজে দেখবে তারা। ইউসুফ মিঞাকে না পেলে চাকরকে বন্দি করা হবে।

—তারপর?

—চাকর তো ভেবে পায় না কী করবে। সবে একুশদিন কেটেছে। পিপের মুখ খুলতে আরও সাতদিন দেরি। কিন্তু কী করা? একটু ভেবে সে দারোগাকে বলল, 'আমাকে কয়েক মিনিট এই ঘরে পিপেটার কাছে থাকতে দিন হুজুর। তারপর আমাকে ধরে নিয়ে যাবেন।' দারোগা রাজি হল।

চাকর মনিবের ঘরে গিয়ে পিপের ঢাকনা খুলতেই একটা ক্ষুদে মানুষ পিপে থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল। একেবারে ইউসুফ মিঞার মতোই দেখতে। পিপে ঘিরে দৌড়তে দৌড়তে ক্ষুদে মানুষটা বলতে লাগল, 'বড় তাড়াতাড়ি খুলে ফেললি রে...বড় তাড়াতাড়ি খুলে ফেললি...।' এই না বলতে বলতে ক্ষুদে ইউসুফ মিঞা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

—তারপর?

—নজর বিন ইউসুফকে আর কখনও দেখা যায়নি। তবে ছুতোরটাকে নিয়ে আরও অনেক কিস্‌সা আছে। সে সব পরে একদিন হবে। এবার আমায় একটু মেহরবানি করো গো, হাত উপুড় করো একটু, নইলে যে পেটে দানাপানি জুটবে না।

সবাই চলে যাওয়ার পর আমি দস্তানবলিয়েকে চেপে ধরলাম। সোলয়মানের সময়ের কিসসা যে জানে, সে এই নিশাপুরের দারুখানা চিনবে না, হতে পারে? ফরিদউদ্দীন আতরকেও সে নিশ্চয়ই চেনে। সব শুনে সে আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাল, 'সে তো প্রায় নশো-হাজার বছর আগে কথা গো। তুমি সেই দারুখানা খুঁজতে এসেছ? আর ফরিদউদ্দীন আতর তো কবেই কবরে ধুলো হয়ে গিয়েছে।'

—সে যে আতর বানাত, এখন আর পাওয়া যায় না?

—না যাওয়ারই কথা। সে আতর কীভাবে বানানো হত, কোন কোন ফুলের সুগন্ধী তাতে থাকত, সে কি আর এখন কারুর মনে আছে? একজন আতরওয়ালার কাছে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি, সে যদি কোনও হদিশ দিতে পারে। তবে তার কাছে আতর কিনতে চেও না। সে শুধু নিজের জন্য আতর বানায়, কাউকে বিক্রি করে না।

আতরওয়ালা ঘরে ঢোকার দরজার ওপর একটা কথা লেখা আছে দেখলাম 'জাহাজডুবিতে যা হারিয়ে যাবে না, সেটুকুই তোমার সম্বল।'

তার ঘরের চারিদিকে, মাথার ওপরে শুধুই আয়নার পর আয়না। আর সেইসব আয়নায় দেখতে পেলাম আতরের অসংখ্য নীল রংয়ের শিশি; এই ঘর যেন সমুদ্রের নীলের গভীরে ডুবে আছে। সেই আতরের গন্ধ পেলাম, যা আমার দাদু রোজ মাখতেন আর প্রতিধ্বনির মতো ভাসছিল কত যে পাখির কলকাকলি।

আতরওয়ালা ফিসফিস করে বলল, 'আমার নাম ফরিদউদ্দীন আতর। আমি জানতাম তুমি একদিন আসবে।'

—কেন?

—তুমিও সেই পাখি, যাকে সিমুর্গের কাছে যেতেই হবে।

—সিমুর্গ কে?

—এখনই সব জানতে চেও না। তুমি সঙ্গে কী এনেছ?

—কিছু না।

—বিশ্বাস?

—না।

—অবিশ্বাস?

—না।

—তাহলে?

আমি পকেট থেকে একটি কলম ও দোয়াতদান বার করে তার পায়ের কাছে রাখলাম।

আতরওয়ালা আমার মাথায় হাত রেখে উচ্চারণ করল, 'ন'। এরপর আমার আর কিছু মনে নেই। অনেকদিন পর দাদুর লাইব্রেরিতে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। আমি কিছুই মনে করতে পারলাম না। কেন লাইব্রেরিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কবে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিছু মনে নেই আমার। শুধু একটা শব্দই আমার মাথার ভিতরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল—'ন'। কী মানে এই শব্দের? কেন এই শব্দটা আমার সঙ্গে রয়ে গেল? জাহিরের সঙ্গে দেখা করলে জিগ্যেস করতে হবে।

শুধু একটা শব্দ—'ন'। তার কাছে ফেলে রেখে দাদু তার আতরের গন্ধ, পাখিদের কিচিরমিচির নিয়ে চলে গিয়েছে। এই 'ন'-কে নিয়ে আমি এখন কী করব?

পুনশ্চ এই 'আষাঢ়ে গল্প'-এর জন্য সুফি সাধকদের সিজদা জানাই।

ছবি তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

পোস্টম্যান

প্রচেত গুপ্ত

আ
আষাঢ়ে

আমি মুখ তুলে লোকটার দিকে তাকালাম। চেহারার মধ্যে আলাদা কিছু নেই। পাড়া গাঁ থেকে কাজ করতে আসা আর পাঁচটা মুটে মজুরের মতো সাধারণ। বরং একটু বেশি রোগাভোগা আর চিমসে মার্কা। কাদা মাখা গেঞ্জিটা গায়ের কালো রঙের সঙ্গে মিশে আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, এখনই গর্ত থেকে উঠে এল।

লোকটা কি কুঁজো? নাকি এমনি-ই কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে? গ্রামের গরিব মানুষগুলোর এই এক অসুখ। শহরে এসে কুঁজো হয়ে যায়।

কানাইলাল বলল, 'স্যার, এই সেই লোক।'

আমি জানি এই সেই লোক, তবু না বোঝার ভান করে ভুরু কুঁচকে বললাম, 'কে? কোন লোক?'

কানাইলাল হাসি হাসি মুখে বলল, 'ওই যে স্যার, ওদের সঙ্গে খবর দেয়া-নেয়া করে।'

আমি বললাম, 'ও, হ্যাঁ এবার মনে পড়েছে।'

কথাটা মিথ্যে। মনে পড়েছে অনেক আগেই। গতকাল দুপুরে কানাইলাল যখন আমার কাছে গল্প করে, তখন থেকেই এই লোকের কথা আমার মাথায় ঘুরছে। কিন্তু সেকথা বলা যাবে না। বললে উদ্ভট জিনিসে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে যাবে। কথাটা ছড়িয়ে যাবে। সবাই ভাববে আমিও ভূতুড়ে কাণ্ডে বিশ্বাস করে বসেছি। নইলে এত আগ্রহ কীসের?

বিশ্বাসের কোনও প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু আগ্রহ যে আমার একটা হয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সামান্য একটা লেবার এরকম কথা বলে বেড়ালে আগ্রহ না হয়ে উপায় কী? আমি ঠিক করেছি, এই লোককে ডেকে জোর ধমক দেব। কাজের জায়গায় এসব জিনিস ঠিক নয়। ঘটনাটা শোনার পর থেকেই আমি চিন্তায় পড়েছি। কাল বাড়িতে ফিরে রত্নাকেও বললাম।

'বলো কী!' রত্না খাওয়া থামিয়ে দিল।

'আমি কিছু বলছি না, কানাই বলছিল। কানাইলাল, আমাদের সাপ্লায়ার। লেবার সাপ্লাই করে।'

'তুমি ওই লোকটাকে দেখেছ?'

আমি মাথার কাছে হাত ঘুরিয়ে বললাম, 'এখনও দেখিনি, নিশ্চয় মাথায় ক্র্যাক আছে।'

রত্না বলল, 'পাগল?'

আমি চোখ বড় করে বললাম, 'তা ছাড়া কী? পাগল না হলে কেউ এরকম কথা বলে? আর একটা জিনিসও হতে পারে।'

রত্না মুখের কাছে রুটি তুলে বলল, 'সেটা কী?'

আমি ভাত খেলেও রত্না রাতে রুটি খায়। ডায়েট করে। ও মোটা নয়, তবু সারাক্ষণ ভয় পায়, এই বুঝি পেটে চর্বি জমে গেল। খাওয়া কন্ট্রোলে রাখে। আমিও রুটির চেষ্টা করেছি। সহ্য হয়নি। গ্যাসের সমস্যায় রাতে ঘুম ভেঙে যায়। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে আবার ভাতে ফিরেছি। আমি ভেতো বাঙালিই ভাল।

'হতে পারে লোকটা পাজি। ভূতপ্রেতের কথা ছড়িয়ে পয়সা কামানোর ধান্দা করছে। লোকটাকে দেখলে বুঝতে পারব।'

রত্না চেয়ারটা টেনে আমার দিকে একটু সরে এল।

ফিসফিস করে বলল, 'ও বাবা, ওই লোককে তুমি দেখবে!'

ওর ভয় দেখে আমি হেসে ফেললাম। ভুরু তুলে বললাম, 'ওমা দেখব না? হাতের কাছে এমন একটা মানুষ পেয়েছি, না দেখে ছেড়ে দেব? চাইলে তুমিও দেখতে পারো। ডাকব একদিন বাড়িতে?'

'ওরে বাবাঃ। আমার দরকার নেই।'

আমি আরও জোরে হেসে উঠলাম। তবে মনের ভেতর দুশ্চিন্তাটা চেপে বসল। লোকটা এসব বলছে কেন? পয়সাকড়ির বিষয়টা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গরিব মানুষ রোজগারের জন্য কত রকম ফন্দি ফিকির বানায়। তবে এই লোকের ফন্দিটা একটু অন্যরকম। কানাইলালকে কাল জিগ্যেসও করেছি।

'এসব রটিয়ে ওই লোক কি টাকাপয়সা কামাতে চায়?'

কানাইলাল মাথা চুলকে বলল, 'না, স্যর সেরকম তো শুনিনি।'

'তাহলে!' আমি খানিকটা অবাক হই।

'মনে হয় মজা করে।' কানাইলাল হাসল।

'এটা একটা মজা করার মতো জিনিস? মৃত মানুষকে নিয়ে ঠাট্টা!'

কানাইলাল একটু চুপ করে থেকে বলে, 'দু-একজন লেবার একটু ভয় পেয়েছে স্যর।'

আমি চেয়ার ঠেলে সোজা হয়ে বসলাম। কানাইলালের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'সে আবার কী? ভয় পেয়েছে! এরকম একটা পাগলামির কথা শুনে ভয় পেয়েছে!'

কানাই হাসল। বলল, 'মুখ্যু সুখ্যু লেবার। একই সঙ্গে মজা পায়, আবার ভয়ও পায়। গরিব মানুষের কাছে ভয়টাও একটা মজার মতো স্যর।'

আমি নড়েচড়ে বসলাম। কাজের জায়গায় এটা তো ঠিক নয়। দু-একটা হাসি মশকরা হতে পারে, কিন্তু সিরিয়াস জিনিস কেন হবে? আমি মাথা নেড়ে গম্ভীর গলায় বললাম, 'না না কানাই, এটা ঠিক নয়।'

'ভয় পেলে কী করব? ছেলেমানুষ তো কেউ নয়। মুশকো জওয়ান সব মজুর।'

আমি বিরক্ত হলাম। বললাম, 'কী আবার করবে, ডেকে ধমক দেবে। যে ভয় দেখাচ্ছে, তাকে ডেকে ধমক দেবে। শুধু তাই নয়, যারা ভয় পাচ্ছে তাদেরও বলতে হবে। এটা একটা ভয় পাওয়ার মতো জায়গা হল? রাজারহাট তোমাদের গা ছমছমে পাড়া গাঁ না কি যে, বাঁশবনে ভূত আসবে? এসব একদম বরদাস্ত করবে না কানাই। কোম্পানির বদনাম হয়ে যাবে। ঠিক আছে তোমাকে কিছু বলতে হবে না, কালই তোমার এই লোকটাকে আমার কাছে ধরে আনবে। যা বলার আমিই বলব।'

কানাইলাল মাথা নামিয়ে বলল, 'তাই করব স্যর। আপনার কাছে ধরে আনব।'

আমাদের প্রজেক্ট চলছে রাজারহাটে। রাজারহাটে এখন যা হচ্ছে সম্ভবত তাকেই বলে কর্মযজ্ঞ। চারপাশে তৈরি হচ্ছে উঁচু উঁচু বাড়ি, ঝাঁ চকচকে রাস্তা, শপিং মল, বাস টার্মিনাস। তবে আমাদের দিকটা এখনও ফাঁকা-ফাঁকা। মানুষের যাতায়াত বলতে শুধু মিস্ত্রি মজুর। মাটি, বালি, ইট বোঝাই লরি ধুলো উড়িয়ে হেলেদুলে ছুটছে মাঠের ভেতর দিয়ে। আমার কোম্পানির অফিস হবে বত্রিশ তলা। আই টি পার্ক। শুনেছি, বারোতলার পর পুরোটা শুধু কাচ। দেয়াল, ছাদ, মেঝে সব কাচের। হলে একটা দেখার মতো জিনিস হবে। তবে এখন সবে জমি টিন দিয়ে মাটি কাটার কাজ শুরু হয়েছে। আমি হলাম সেই মাটি কাটার সুপারভাইজার। কাজ হিসেবে খুবই সামান্য। রত্না অবশ্য বলে বেড়ায় তার স্বামী আই টি সেক্টরে কাজ করছে। আমি রাগ করি। কঠিন রাগ নয়, হালকা রাগ। কথাটা একেবারে মিথ্যে তো নয়। কাজ যা-ই হোক, জায়গাটা তো...। কোম্পানি আমার জন্য ব্যবস্থা খারাপ করেনি। ইটের গাঁথনি আর অ্যাসবেস্টরের চাল দিয়ে সাইট অফিস বানিয়ে দিয়েছে। অফিসের জানলা দরজায় পর্দা। কম্পিউটারও দিয়েছে। তাতে হিসেব থাকে। মাটি কাটার হিসেব। কতটা মাটি উঠল, কাজ করছে ক'টা মেশিন, ক'জন মজুর লেগেছে—এই সব।

কানাইলাল হল আমাদের লেবার কন্ট্রাক্টর। অন্য মজুর নয়, শুধু মাটি কাটার মজুর সাপ্লাই করে। আশ্চর্যের বিষয় হল, এ বিষয়ে তার একটা কোম্পানিও আছে! নাম 'সয়েল অ্যান্ড কয়েল'। আমি একবার জিগ্যেস করেছিলাম, 'এ আবার কীরকম নাম! সয়েল তো বুঝলাম, কয়েলটা কী?' কানাইলাল লজ্জা লজ্জা গলায় বলল, 'কোনও মানে নেই, এমনি দিয়েছি। সয়েলের সঙ্গে মিলিয়ে কয়েল। আজকাল জমি মাটির কারবারে সাহেবসুবো লোক আসে স্যর। একটা ইংলিশ নাম লাগে। নইলে ইজ্জত পাওয়া যায় না।'

নাম যা-ই হোক। সস্তায় মজুর সাপ্লাইতে কানাইলাল ইতিমধ্যেই নাম করেছে। এই লাইনে সকলেই মোটামুটি জানে, 'সয়েল অ্যান্ড কয়েল' থেকে লোক নিলে ঝুট ঝামেলা নেই।

শুধু এই ঝামেলাটা হল। একে কি ঝামেলা বলব?

গতকাল দুপুরে টিফিনের পর সাইটে চক্কর মারলাম। এই সময়টা কাজে একটা ভাঁটা পড়ে। লেবাররা কোদাল ঝুড়ি ফেলে খানিকক্ষণ গা ছেড়ে দেয়। একবার নিজে না ঘুরে দেখলে মুশকিল। শুধু কাজের জায়গা নয়, যে পাশটায় মিস্ত্রি মজুরদের থাকবার ছাউনি হয়েছে সেদিকটাও যেতে হয়। আয়োজন ছোট নয়, প্রায় শ'খানেক লোকের রাতদিন থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা। অফিসে ফেরার সময় কানাইলালকে ডেকে নিলাম। হেড অফিসে রিপোর্ট দিতে হবে। কতটা কাজ এগলো তাই নিয়ে রিপোর্ট। প্রতি সোমবার করে মাটি কাটার রিপোর্ট নিয়ে আমি কলকাতায় হেড অফিসে যাই। এখান থেকে দূর কম নয়। বড় রাস্তাতে পৌঁছতে মাঠ, জল, কাদা মারাতে হয়।

কানাইলালের সঙ্গে কথা বলে সন্তুষ্ট হলাম। কাজ ভালই এগোচ্ছে।

'তোমার লেবাররা এবার ভালই দেখছি কানাই। ফাঁকি টাকি মারে না। বর্ধমানের কাজটার সময় খুব ভুগিয়েছিল।' কানাইলাল গদগদ ভঙ্গিতে বলল, 'ফাঁকিবাজগুলোকে সব তাড়িয়েছি স্যর। এই লট একেবারে এক্সপোর্ট কোয়ালিটি।'

আমি টেবিলের কাগজপত্র গোছাতে গোছাতে বললাম, 'ওরা বলে কী? পেমেন্টে খুশি তো?'

কানাইলাল হেসে বলল, 'খুশি না হয়ে উপায় আছে স্যর? আপনার এখানে তো পাওনা বাকি কিছু থাকে না। সব একেবারে কারেক্ট। এদিকে স্যর এখানে একটা মজার কাণ্ড হয়েছে।'

'মজা!' আমি মুখ তুললাম।

কানাইলাল হাসিমুখেই রয়েছে। বলল, 'হ্যাঁ স্যর, আমার এক লেবার অদ্ভুত কথা বলছে। ভূতের কথা।'

'ভূতের কথা! সে আবার কী!'

কানাইলাল ঘাড় ঘুরিয়ে একবার পিছনে দরজার দিকে তাকাল। তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'বলছে, সে না কি মরা মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে।'

আমি ফাইল হাতে থমকে দাঁড়ালাম। ঠিক শুনলাম তো! কানাইলাল বলছেটা কী!

'কী! কী করতে পারে বললে?'

কানাইলাল দাঁত বের করে হাসল। বলল, 'মরে যাওয়া মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। কিছু খবর টবর দেওয়ার থাকলে পৌঁছে দেয়, আবার নিয়েও আসে। এই যেমন এখানকার আত্মীয় স্বজন কেমন আছে। ওদিককার খবরই বা কীরকম—এই সব। পোস্টম্যানের মতো।'

কথা শেষ করে 'খ্যাঁক খ্যাঁক' আওয়াজ করে হাসল কানাইলাল।

আমি ধমক দিয়ে বললাম, 'কী যা-তা বলছ? পাগল টাগল জোটালে নাকি?'

কানাই চেয়ারে হাত রেখে বলল, 'তাই হবে স্যর। পাগলই হবে। লোকটা এবারই প্রথম আমার এখানে কাজ করছে। মতিলাল এনেছে ওকে।'

'মতিলালটা আবার কে?'

'মতিলাল মাঝে মধ্যে গ্রাম দেশ থেকে আমার জন্য লোক ধরে আনে। এই পাগলটা ওর শ্বশুরবাড়ির দিকে কোথায় থাকত। গত মাসে মতি নিয়ে এল। বলল, ছেলেরা বুড়োকে বাড়ি থেকে বিদায় করেছে। কাজ পেলে খায়, নইলে চেয়েচিন্তে চলে। কাজ না দিলে মরে যাবে। বললাম, থাকুক। মাটি কাটতে তো বিরাট পণ্ডিত লাগবে না। এখন শুনেছি, এই কাণ্ড। তাও দু'দিন আগে শুনলাম, বেটা নাকি কয়েকজনকে ওই কথা বলেছে।'

আমি আবার চেয়ারে বসে পড়লাম।

'কী বলেছে?'

'বলেছে, তোমাদের যদি খবর টবর দেওয়ার থাকে বলো ক্ষণ, অসুবিধে কিছু নাই। একজন নাকি তার শালাকে খবর পাঠিয়েছে। শালা গত বছর সাপের কামড়ে মরেছিল।

আমি বুঝতে পারছি, আমার চোখ স্থির। পাতা কি পড়ছে? মনে হয় না পড়ছে। বিড়বিড় করে বললাম, 'কী খবর?'

কানাইলাল ছোপ পরা দাঁত বের করে বলল, 'বাড়ি ঘরের খবর। চালা না কী ভেঙে গিয়েছে। মরা শালার কাছ থেকে ঘর সারানোর পারমিশান নিয়েছে বেটা।'

কথাটা বলে আবার খানিকটা হাসল কানাই। তারপর বলল, 'ওই হারামজাদার দেখাদেখি, আরও দু-একটা খেপেছে। কে যেন তার বাপ কেমন আছে জানতে চায় শশধরের কাছে। সে বুড়ো মরেছে তেরো বচ্ছর হয়ে গেল।'

'শশধর! শশধরটা কে?'

'শশধর ওই লোকের নাম স্যর। গুপি নামের এক মজুর তো মারাত্মক কাণ্ড করেছে। ছেলের সঙ্গে কথা বলবে বলে একেবারে ঝুলোঝুলি। ছেলে কলেরা না আন্ত্রিকে মরেছিল সাত বছর বয়েসে। তাও বছর তিন-চার হয়ে গিয়েছে। বুঝুন কাণ্ড! তিন বছর আগের মরা ছেলের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে! শশধর বলেছে, কথা বলাতে পারব না, আমি শুধু খবর দেয়া-নেয়া পারি। খবর থাকলে বলো।'

আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। তবে এটা বুঝতে পারছিলাম, এই জিনিস বন্ধ করতে হবে। গাঁজাখুরি গুজব খুব তাড়াতাড়ি ছড়ায়। এটাও ছড়াবে।

কানাইলাল বলল, 'তবে শুধু মজা নয়, লেবারদের মধ্যে কেউ কেউ ভয়ও পাচ্ছে স্যর।'

এরপরই আমি কানাইলালকে জানাই, ওই লোকের সঙ্গে আমি দেখা করব। নিজে ধমক দেব।

কাল সারাদিন মনের ভেতরটা খচখচ করেছে। হেড অফিসে রিপোর্ট বলার সময় উল্টোপাল্টাও হয়ে গেল। বাড়িতে ফিরে রত্নাকে গল্পটা করলাম।

'বলো কী! লোকটা নিজেও ভূত নাকি?'

'ভূত না হলেও শয়তান তো বটেই। টাকা পয়সা না চাইলে বুঝতে হবে অন্য কোনও ফন্দি আছে। এরপর হয়তো দেখব সাইটের ওখানে ভূত নামানোর পুজো টুজো বসিয়ে দিয়েছে। এর বাবা, ওর শ্বশুর, মরা কাকা-জ্যাঠারা সব সেখানে ভিড় করেছে।'

রত্না বলল, 'ওরকম করে বোলো না, আমার কিন্তু ভয় ভয় করছে।'

আমি হেসে বললাম, 'প্রথমে ভেবেছিলাম, কানাইয়ের হাতেই ব্যাপারটা পুরো ছেড়ে দেব। তারপর ভেবে দেখলাম, সেটা ঠিক হবে না। কড়া কোনও স্টেপ নেওয়া দরকার।'

রত্না কাঁপা গলায় বলল, 'কী স্টেপ নেবে? যাই করো বাপু সাবধানে করবে। ওসব লোক তন্ত্র মন্ত্র জানতে পারে। শ্মশানে এরকম তান্ত্রিক থাকে শুনেছি। বইতেও পড়েছি। মরা মানুষের খুলির সঙ্গে কথা বলে।'

আমি সামান্য হেসে বললাম, 'আমার ওটা শ্মশান নয় রত্না। প্রথমে ওয়ার্নিং দেব, তাতেও যদি কাজ না দেয়, দূর করে দেব। আজকাল তাড়ানো খুব সহজ ব্যাপার। বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার, ম্যানেজারকে আজকাল ফুৎকারে তাড়িয়ে দেওয়া যায়, একটা সামান্য মজুরকে তো তুড়ি দিলেই হবে।'

কানাইলাল সেই লোককেই এখন এনেছে। কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে।

নাম জানি তবু জিগ্যেস করলাম, 'তোমার নাম কী?' একটা কিছু দিয়ে তো কথা শুরু করতে হবে।

লোকটা চুপ করে রইল। কানাইলাল ধমক মেরে বলল, 'কীরে নাম বল, চুপ করে আছিস কেন? বল নাম।'

'শশধর হুজুর।' লোকটা জড়ানো গলায় বলল। মদ টদ খায় না কি?

কানাইলাল দাঁত খিঁচুনি দিয়ে বলল, 'পস্ট করে বলো।'

আমি হাত তুলে বললাম, 'তুমি চুপ করো কানাই, ওকে বলতে দাও।' তারপর সহজ গলায় বললাম,

'শশধর, তুমি মাটি কাটে?'

'হ্যাঁ হুজুর কাটি, তবে সবসময় পারি না।'

খেয়াল করে দেখলাম লোকটার চোয়াড়ে মুখে খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়িও আছে। বয়স একেবারে কম নয়। চাউনির মধ্যে একটা ফালফ্যালে ভাব। একেই কি ইংরেজিতে বলে ভেকেন্ট লুক?

'হুজুর বাঁ হাতের এই খানটা ভেঙেছিল, তারপর থেকে অনেকক্ষণ কোদাল ধরলে ব্যথা পাই।'

শুধু পাগল নয়, লোকটা অকর্মণ্যও বটে। কানাই এটাকে জোটাল কেন কে জানে? এর সঙ্গে বেশি বকবক না করে সরাসরি আসল কথাতেই যাওয়া ভাল।

'শশধর তোমার নামে যা শুনেছি, সেটা কি সত্যি; তুমি কি সত্যি মৃত মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো?'

শশধর চুপ করে রইল। ভেবেছিলাম, লোকটা লজ্জায় মাথা নামিয়ে ফেলবে। অন্যায় কাজ ধরা পড়ে যাওয়ার পর সাধারণত সবাই যা করে। এও সেরকম কিছু করল না। একই ভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কানাইলাল ফিসফিস করে বলল, 'কীরে বল? স্যর যা জিগ্যেস করছে জবাব দিবি তো।'

আমি আবার হাত তুলে কানাইলালকে থামালাম। নরম গলায় বললাম, 'কথাটা ঠিক?'

শশধর এবারও মুখে উত্তর দিল না। শুধু একপাশে ঘাড় নাড়ল। লোকটা বলে কী! পারে! আমি ভেবেছিলাম, এসব জিগ্যেস করলেই পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কাজ যাতে না যায় তার জন্য কান্নাকাটি জুড়ে দেবে। এ তো উল্টো কাণ্ড! আমি নড়েচড়ে বসলাম। মজা পাচ্ছি। একটু হেসে বললাম, 'কীভাবে করো? নাম ধরে ডাকো? মনে মনে? নাকি রাতের বেলায় ফাঁকা মাঠে হাঁক দাও?'

শশধর আমার রসিকতা ধরতে পারল না। বিড়বিড় করে বলল, 'আমি মাটিতে বলি, ওরা শুনতে পায়।'

'মাটিতে বলো!' একটু চমকালাম কি?

'হ্যাঁ, যখন কাজ করি তখন বলি। বলতে বলতে এক সময় সাড়া পাই। মাটি দিয়ে কাজ করি তো, তাই মাটি দিয়ে ডাকি।'

লোকটা সত্যি উন্মাদ। আমি কানাইলালের মুখের দিকে তাকালাম। তার ভুরু কোঁচকানো। মুখে টেপা হাসি। ভাবটা এমন—দেখলেন তো স্যর, বলেছিলাম কি না? এখন কী করা উচিত। জোর এক ধমক দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিই?

ঠান্ডা গলায় বললাম, 'কীভাবে ডাকো? তোমার

আশেপাশে যারা কাজ করে, তারা শুনতে পায়?'

'না পায় না। আপনে ধরেন কাউরে কিছু জানাতে চান, আমারে নামটা আর খবরটা বললেন, আমি তারে ডেকে চুপিচুপি কতাটা বলে দিই।'

'বলে দাও! ডেডম্যান, মানে মরা মানুষকে তুমি দেখতে পাও শশধর?'

'না পাই না, বুঝতে পারি। এলে মাটিতে কাঁপুনি লাগে। জোরে নয়, অতি সামান্য কাঁপুনি। ওই কাঁপুনির মধ্যে গলাও শুনতে পাই।'

কানাইলাল আর পারে না। ডান হাতটা তুলে বলে, 'চোপ, একদম চোপ হতভাগা। গপ্প বানানোর জায়গা পাওনি। ইঃ কাঁপুনি লাগে! ফাজিলটার কানের গোড়ায় দেব এক ঘা।'

আমি কানাইলালের ধমকে গুরুত্ব দিলাম না। বুঝতে পারছি, কথা বেশি হয়ে যাচ্ছে। বেশি কথা মানে মানসিক রোগগ্রস্থ এই মানুষটাকে আশকারা দেওয়া। সেটা ঠিক নয়। আমার উচিত এখনই এই লোকের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করা। একজন সামান্য মজুরের সঙ্গে ভূত বিষয়ক দীর্ঘ আলোচনা চলতে পারে না।

কিন্তু থামতে পারছি না। এতক্ষণ যে ঘটনা শুধু আগ্রহ তৈরি করেছিল, মজা দিচ্ছিল, সেটাই ক্রমশ আমার ভেতরে কেমন যেন দাঁত নখ বের করে চেপে বসছে! কেন?

'মরা মানুষের সঙ্গে কথা বলার ক্ষমতা তুমি কবে থেকে পেয়েছ শশধর? জন্ম থেকে?

কানাইয়ের ধমকে এই লোকের চোখের চেহারা বদলেছে। এতক্ষণ ফ্যালফ্যালে ছিল, এবার খানিকটা ভয়ের ভাব এসেছে। বুকের কাছে হাতদুটো জড়োসড় রেখে বলল, 'জানি নে হুজুর। আঞ্জু বুড়ির মেয়েকে খপর দিতে গিয়ে দেখলাম আমি কাজটা পারছি।'

'আঞ্জু বুড়ি! সে আবার কে?' আমি টেবিলের ওপর একটু ঝুঁকে পড়লাম।

'আমাদের গাঁয়ের মানুষ। একদিন বিকেলে দেকি পথের ধারে বসে হাঁপায়। বুকটা হাপরের মতো ওঠে আর নামে। ওঠে আর নামে। আমি বললুম, কী হল গো বুড়িমা? বুড়ি চোখ উল্টে বললে, মেয়েটাকে একটা খপর দে বাবা, বল আমি আসছি। আমি খপর দিলুম, বুড়িও মরল সন্ধের পর পর।'

'খবর দিলে মানে? বাড়ি থেকে মেয়েকে ডেকে আনলে?'

'ডেকে আনব কী হুজুর, বুড়ির তো বাড়ি ঘর কিছু নাই। একটা মাত্র মেয়ে ছিল, সেও পাঁচ বছর আগে বাচ্চা হতে গিয়ে শ্বশুরবাড়িতে মরেছে। মুক্তি না লক্ষ্মী—কী যেন নাম ছিল তার। পথের ধারে বসে ওই মরা মেয়েকেই তাকেই খপর দিলুম।'

লোকটা বানাচ্ছে। গল্প বানাচ্ছে। কিন্তু বানানোর ক্ষমতাটাও দারুণ। গল্পটা থেকে চট করে বেরতে পারা যায় না। আমাকেই ধরে ফেলেছে, মিস্ত্রি মজুরদের ধাঁধায় ফেলতে কতক্ষণ?

'কী খবর?'

কানাইলাল এবার এগিয়ে এসে শশধরের কাঁধে হাত রাখল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'ব্যস অনেক হয়েছে, অনেক হয়েছে। ভূত, পেত্নি, ব্রহ্মদত্তি সব শুনলাম। এবার কাজে যাও তো বাপু। স্যারেরও কাজ আছে, নাকি সারাদিন তোমার বকবকানি শুনলে হবে? যা ভাগ।'

মাঝপথে আটকাতে আমি বিরক্ত হলাম। কানাইলালকে ঝাঁঝালো গলায় বললাম, 'আঃ কানাই, চুপ করো। আমার কথার মধ্যে বারবার ঢুকছ কেন?' তারপর শশধরের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত গলায় বললাম, 'মরা মেয়েকে কী খবর দিলে?'

শশধর ভয় পেয়েছে। কানাইয়ের দিকে তাকিয়ে কাঁচুমাচু গলায় বলল, 'আমি আসি হুজুর। আমায় ছেড়ে দেন।'

আমি ভেতরে ভেতরে একটা অস্থিরতা অনুভব করছি। ঠান্ডা গলায় বললাম, 'কথা শেষ করে যাও শশধর। বুড়ির মরা মেয়েকে কী খবর পাঠালে সেটা বলে যাও।'

'কী আর বলব? বললুম, ঘরদোর ধোওয়া মোছা করো, জল তুলে রাখো, তোমার কাছে তোমার মায়ে যায়।'

আমি বিড়বিড় করে বললাম, 'ওই লক্ষ্মী না মুক্তি শুনতে পেল?'

শশধর খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাটিতে কাঁপন পেলাম হুজুর। তারপর থেকেই...।'

আমার গা কি একটু শিউরে উঠল? না মনে হয়। কী করে হবে? কেনই বা হবে? আমি তো আর ভয় পাইনি। টেবিলে রাখা জলের গেলাস তুলে এক চুমুকে শেষ করলাম। যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে অস্বস্তিটা ঝেড়ে ফেলতে চাইলাম। শুধু গল্প বলা নয়, এই লোকের অভিনয় ক্ষমতাও চমৎকার। কত স্মার্ট ভঙ্গিতে একটা অলৌকিক বিষয়কে সত্যি বলে চালানোর চেষ্টা করছে! এরকম একটা কড়কড়ে রোদের সকালে ভূতের গল্প ফাঁদা চাট্টিখানি কথা নয়। এই লোক সেটা খানিকটা হলেও পেরেছে। ধাপ্পাবাজদের মধ্যে এই গুণ অবশ্য প্রায় দেখা যায়। তারা অভিনয়ও ভাল করে। সমস্যা হল, কথা শুনে এই আধবুড়ো লোকটাকে সেরকম মনে হচ্ছে না। সম্ভবত এই কারণেই অস্বস্তি তৈরি হচ্ছে।

একটা কাজ করলে কেমন হয়? বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে? হোক। লোকটা কতখানি গোলমেলে সেটা বোঝা যাবে। জালিয়াত, পাগল—সবকিছুরই তো একটা মাত্রা আছে। এই লোকের সেই মাত্রাটা কতখানি? নিজের ইন্টারেস্টেই জানা দরকার। একটা মজাও হবে। রত্নাকে বাড়িতে গিয়ে যখন বলব, ভয় পাবে। কিন্তু তার আগে কানাইলালকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া দরকার। এ কথা ওর সামনে বলা যায় না।

'কানাই গত সপ্তাহের রিপোর্টটা আছে নাকি?'

'আমার ব্যাগে আছে স্যার। ব্যাগটা স্যার বাইরে।'

'চট করে নিয়ে এসো দেখি। ততক্ষণে তোমার শশধরের সঙ্গে কথা শেষ করি।'

কানাইলাল ইতস্তত করল। আমি ভুরু কুঁচকে তাকাই।

'যাও, দেরি করছ কেন?'

কানাইলাল আমার বিরক্তি বুঝতে পারে, খানিকটা যেন অবাক হয়ে ঘর ছাড়ল সে। মুহূর্ত কয়েক নিজের মনে কথাটা সাজিয়ে নিয়ে সরাসরি তাকালাম লোকটার

দিকে।

'আমার একটা কাজ করে দিতে পারবে?'

মাথা নামিয়ে আছে শশধর। একা ঘরে তাকে যেন এবার একটু অন্যরকম লাগছে। সে কী বেলা বাড়ছে বলে? বেলা বাড়ালে মানুষের কি চেহারা বদলায়?

'চেষ্টা করব হুজুর।'

আমি চেয়ারটা সামান্য পিছনে ঠেলে নিলাম। তারপর খানিকটা আপন মনেই বলতে থাকি—

'মেয়েটার ভাল নাম মালবিকা। আমরা মালা ডাকতাম। কলেজের ফার্স্ট না সেকেন্ড ইয়ার চলছে, তা প্রায় তেইশ, চব্বিশ বছর আগের ঘটনা। বলা নেই কওয়া নেই, একদিন কলেজে গিয়ে শুনি মালা গলায় দড়ি দিয়েছে।'

এতটা পর্যন্ত বলে চুপ করে গেলাম।

'কী খপর বলব হুজুর।'

'না না খবর কিছু বলতে হবে না...শুধু জিগ্যেস করবে, জিগ্যেস করবে কেন এরকম করেছিল সে...বলবে আমি জানতে চেয়েছি...। পারবে?'

প্রশ্নটা শেষ করে ঠোঁটে ঠাট্টার হাসি এনে মুখ তুলে তাকাই। তাকিয়ে চমকে উঠি। কুঁজো মানুষটা একদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে। চোখদুটো যেন মানুষের নয়। মাটির চোখ! মাটির দৃষ্টি! সেই দৃষ্টি তীব্র, তীক্ষ্ণ সূচের মতো আমার গভীর পর্যন্ত গেঁথে, কেটে দেখতে দেখতে চলেছে!

রাতে খেতে বসে ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করে উঠে পড়লাম। রত্না বলল, 'শরীর খারাপ।'

'খারাপ নয়, একটা অস্বস্তি হচ্ছে। কে জানে গ্যাসের প্রবলেমটা ফিরে এল হয়তো।'

'ওষুধ খাবে?'

'দেখি, রাতে দরকার হলে খাব।'

বিয়ের পর থেকেই দেখছি রত্না খাবার সময় চিবোয় বেশি। প্রথম প্রথম ভাবতাম হজমের জন্য করে। পরে শুনলাম, শুধু তাই নয়, এতে নাকি দাঁতের সেটিং ভাল থাকে। চিবোতে চিবোতেই রত্না বলল, 'সেই লোকটার সঙ্গে দেখা হয়েছে? ডেকেছিলে তাকে?'

আমি চমকে ফিরে তাকালাম। রত্নার মনে আছে!

'কোন লোক?'

রত্না হেসে বলল, 'বাঃ ওই যে ভূতের সঙ্গে কথা বলতে পারে, তোমাদের মাটি কাটার লেবার? ডাকোনি তাকে?'

আমি মুখ ফিরিয়ে গম্ভীর গলায় বললাম, 'খেপেছ? কাজের জায়গায় পাগলামির সময় কোথায়? কোথা থেকে একটা চিটার ধরে এনেছে কানাই বেটা।'

রত্না বলল, 'ওরকমভাবে বলছ কেন? গরিব মানুষ, অভাবে যে কত কী করে তার ঠিক আছে? মরা মানুষের সঙ্গে কথা বলা তো সহজ কাজ, আমাদের কোন্নগর স্টেশনে একটা জোয়ান লোক মরা সেজে পড়ে থাকত। পাশে ছেলে, বউ ভিক্ষে করত। পোড়ানোর খরচ চাই।'

আমি গজগজ করে উঠলাম, 'ওসব ফাজলামি তোমার কোন্নগর স্টেশনে হতে পারে রত্না, আমার প্রজেক্টের ওখানে চলতে পারে না। হেড অফিসে যদি খবরটা পৌঁছয় আমার অবস্থাটা কী হবে ভেবে দেখেছ? আই টি পার্কে ভূত! ছি ছি।'

রত্না অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। বলল, 'আমার ওপর রেগে যাচ্ছ কেন? আমি কী করলাম?'

নিজেকে দ্রুত সামলালাম। সত্যি তো, রেগে যাচ্ছি কেন? আর রাগ করলে নিজের ওপর করা উচিত। ওই জালিয়াতটাকে হুট করে মালবিকার কথাটা বলা উচিত হয়নি। কোনও কিছুই বলা উচিত হয়নি। আর যদি বলতেই হয়, মরা লোকের কি অভাব ছিল? দাদু, মামা, কাকা যে কারও কথা বলতে পারতাম। মালা কে? হু ইজ মালা? তাতে কতটুকু চিনতাম? কিছুই নয়। দু-পাঁচ দিন তার সঙ্গে ঘুরেছি মানে এই নয় এত বছর পরেও তার কথা মনে পড়বে। হঠাৎ মালবিকার কথা মনেই বা পড়ল কেন!

খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও ওই লোক কি আমাকে প্রভাবিত করেছে?

এলআইজি ফ্ল্যাটের একফালি বারান্দায় এসে দ্রুত হাতে নম্বর টিপলাম। মোবাইলের ছোট্ট পর্দায় ভেসে উঠল—সয়েল অ্যান্ড কয়েল।

'হ্যালো কানাইলাল? ঘুমিয়ে পড়েছ?'

স্কুটারটা গড়বড় করছিল। গ্যারেজে দেখিয়ে সাইটে আসতে খানিকটা দেরি হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে কম্পিউটার চালু করলাম। কানাইলাল ঢুকল প্রায় আমার পিছু পিছু। মুখে হাসি।

'ভূতটাকে তাড়িয়ে দিয়েছি স্যর।'

আমি মুখ তুললাম। কানাই দাঁত বের করেই আছে। সেই অবস্থাতেই বলল, 'আপনার অর্ডার মতো আজ ভোরেই পাওনা গন্ডা বুঝিয়ে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। বললুম বাছা, ভূতগিরি এখানে চলবে না। মাটি কাটা ছেড়ে তুমি বরং কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে পোস্টম্যান হয়ে যাও। মরা মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চিঠি দেওয়া নেওয়া করো। সামান্য কম্মে তোমায় মানাবে না।'

কথা শেষ করে 'হ্যা, হ্যা' করে হাসতে লাগল কানাইলাল।

'নিতাই হারামজাদাকেও ধমকে দিয়েছি স্যর, বলেছি, ভবিষ্যতে এরকম পাগল ছাগল নিয়ে এলে তারও বিপদ আছে। সব সহ্য করব কিন্তু সয়েল অ্যান্ড কয়েলের বদনাম সহ্য করব না।'

আমি মাউসে ক্লিক করে চোখের সামনে মাটির হিসেব খুললাম। নিচু গলায় বললাম, 'শশধর কিছু বলল?'

'বলবে আবার কী? চুপচাপ পোঁটলা পুঁটুলি গুছিয়ে নিল। ও হ্যাঁ, আপনাকে জানানোর জন্য শুধু একটা কথা বলেছে স্যর।'

এই পর্যন্ত বলে কানাইলাল মাথা চুলকোতে লাগল। আমি তাকালাম।

'কী বলেছে?'

'স্যর, মালা না মালবিকা কী যেন নাম বলল, ইস নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। যাই হোক, সেই ভদ্রমহিলা নাকি আপনাকে বলে পাঠিয়েছে...।'

কথাটা শেষ করে কানাইলাল মুচকি হাসল। নিচু গলায় বলল, 'ভূতটুত নাকি স্যর?'

বাড়ি ফিরলাম তাড়শ জ্বর নিয়ে।

আ
আষাঢ়ে

অমর মিত্র

হাওয়া যায় হাওয়া আসে

বিকেলে সিগারেট কিনতে বেরিয়ে উধাও, রোবে রোবে আট, আজ ন'দিন হল। এইরকম তো আগেও হয়েছে। একবার বাজারের থলে হাতে সুন্দরবন চলে গিয়েছিল চিত্রভানু, কার সঙ্গে যেন। থানায় পর্যন্ত ছুটতে হয়েছিল সেবার। মহুয়া এবারও ভাবছিল, থানায় যাবে কি না। গিয়েই বা কী হবে? পুলিশ বলবে, চিত্রভানুবাবু তো! উনি ফিরে আসবেন, খামোকা খোঁজ করে কী হবে? মহুয়া ভাবছিল, ফোন করবে কি না একে ওকে। তরুণ কবিদের কেউ না কেউ জানতে পারে। একবার শুভময় এসে খবর দিয়েছিল, বউদি, ভানুদা বিকেলের কামরূপ এক্সপ্রেস ধরে নর্থ বেঙ্গলের দিকে গেলেন, ওদিকে বর্ষা আগে নামবে তো!

ন'দিন কোনও সাড়া নেই। বিকেলের পর বিকেল গেল, সন্ধের পর সন্ধে গেল, একটা ফোন তো আসবে। মোবাইল ফোন একটা কিনে দিয়েছিল মহুয়া। দু'বার হারানোর পর, এখন আর নিয়ে বেরয় না চিত্রভানু। কেন নেবে, মোবাইল ফোন যেন পুলিশের খোঁচড়, সবসময় ওকে দিয়ে মহুয়া তার উপর নজরদারি করছে। সেই ফোন এল ল্যান্ডলাইনে রাত আটটা নাগাদ। তখন পুরো এলাকা অন্ধকার। একটা এমার্জেন্সি আলো অন্ধকারকে একটু নরম করেছিল মাত্র। খোলা জানালা দিয়ে যতদূর দেখা যায়, অন্ধকার শহর অন্ধকারেই দপদপ করছে। ফোন তুলতেই ডাক এল, মহুয়া!

খুব অভিমান হল মহুয়ার। বলল, মহুয়া কোনও কথা বলবে না।

বলতে হবে না মহুয়া, একটু মন দিয়ে শোনো।

মহুয়া বলল, শোনার কী আছে, যেদিন খুশি ফিরো।

ফিরব মহুয়া, ট্রেন তো এখানে যে কোনওদিন আচমকা থামে। থামলেই উঠে পড়ব। তবে যোগব্রত যদি না ছাড়ে, পাগলাটা এখন এই মধুগঞ্জে থাকে।

কে?

যোগা, যোগব্রত, পেন্টার যোগা কলকাতা থেকে পালিয়ে এখানে এসে উঠেছে। শোনো মহুয়া, আমি আর যোগা এখন অশ্রু, নদীর তীরে বসে আছি, নদীর ওপারে অন্ধকার, চাঁদ উঠছে একা একা।

তুমি কোথা থেকে, কার বাড়ি থেকে কথা বলছ?

কারও বাড়ি থেকে নয়, মধুগঞ্জ থেকে।

মধুগঞ্জ? সে কোথায়?

জানি না মহুয়া, ট্রেনটা মাঝরাত্তিরে থেমেছে একটা জায়গায়, সেখানে কোনও স্টেশন ছিল না। যোগব্রত বলল, নাম। এসে গিয়েছি। আমি জিগ্যেস করলাম, কোথায় এলাম? ও বলল মধুগঞ্জ।

মধুগঞ্জ! এই নামে কোনও জায়গা, স্টেশন আছে নাকি?

আছে, না থাকলে এলাম কী করে মধুগঞ্জে?

কোথায় ওটা, কোন দিকে?

তাও তো জানি না মহুয়া। যোগব্রত বলল, ওঠ ট্রেনে, উঠলাম, নামতে বলল, নেমে পড়লাম। এখানে যে কোনও ট্রেন যে কোনওদিন মাঝরাত্তিরে এসে পৌঁছয়,

ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

তবে সব ট্রেন আসে না।

কতটা হয়েছে, সত্যি করে বলো দেখি।

চিত্রভানু বলল, হয়নি মহুয়া হয়নি, শুধু অশ্রু নদীর জলপান করছি।

আমি কি এবার সত্যিই পুলিশে যাব?

চিত্রভানু বলল, যেতে পার, কিন্তু কেন যাবে? পুলিশের কি সাধ্য আছে, আমাকে খুঁজে বের করার? আমি কলকাতায় লুকিয়ে থাকলেও পারবে না। উর্দিতে মাথার বুদ্ধি কমে যায় মহুয়া।

বাজে কথা বোলো না, তুমি কলকাতার কোথায় আছ?

মধুগঞ্জে আছি মহুয়া, শোনো যোগব্রতকে তোমার মনে আছে, অসাধারণ ছবি আঁকত! তার সঙ্গে আচমকা দেখা হয়ে গিয়েছে ক্রিক লেন-এ। তখন ওদিকে লোডশেডিং, কী অদ্ভুত ব্যাপার! ক্রিক লেনে না গেলে আমার সঙ্গে যোগার দেখাই হত না, মধুগঞ্জের খোঁজই পেতাম না।

তুমি কী বলছ জান?

জানি মহুয়া, সেই যোগব্রত, ছ'ফুট প্রায়, গাল ভর্তি দাড়ি, নীল চোখ, হলুদ রঙের পাঞ্জাবি আর আধ ময়লা পায়জামা। তখন আমাদের বিয়ে হয়নি। ওর এগজিবিশন দেখতে গেলাম, একাডেমিতে।

ওফ ভানু! তুমি কথা থামাবে, নেশায় তোমার তাল-জ্ঞান, অগ্র-পশ্চাত সব হারিয়ে যায়। কার কথা বলছ?

কেন যোগব্রত, মনে নেই, তার জন্য তুমিও কেঁদেছিলে।

গা কেঁপে উঠল। মহুয়া চুপ করে থাকল। কোথা থেকে ফোন করছে, বোঝার উপায় নেই। যদি কলার আই ডি থাকত এই ফোনে! মোবাইলে কিছুতেই ফোন করে না চিত্রভানু। বলে অত বড় নম্বর মনে থাকে না, আসলে কোথায় আছে, তা খুঁজে বের করা সহজ হবে। মহুয়া চুপচাপ হয়ে ছিল। ওপার থেকে ডেকেই যাচ্ছিল চিত্রভানু। মহুয়া না পেরে জিগ্যেস করল, কীভাবে দেখা হল?

আমি দেখতে পাইনি মহুয়া, অন্ধকারে সিগারেট জ্বালাতে দেশলাই ঠুকেছি, ওইটুকু আলোতেই ও আমাকে চিনে ফেলে, রাস্তার ওপার থেকে লাফ দিয়ে এসে হাত ধরে ফেলেছে, চিত্রভানু না?

সে তো বেঁচে নেই শুনেছিলাম। গলাটিকে নিস্পৃহ করে তুলল মহুয়া।

ভুল জানি মহুয়া, সবাই ভুল জানি, এই তো সে মধুগঞ্জের মধুপাহাড়ের গায়ে সমস্ত জীবন ধরে ছবি এঁকে যাচ্ছে, কী অপূর্ব তার রং! অমন রং আমরা এ জীবনে দেখিনি।

মহুয়া বলল, ভানু তুমি স্থির হও, কোথায় আছ পরিষ্কার করে বলো।

কতবার বলব, অশ্রুনদীর তীরে, ওই যে ওপারে তার ঘাট দেখা যায়।

তুমি দিশা হারিয়ে ফেলেছ ভানু।

এখানে এলে এমন হয় মহুয়া।

মহুয়া চুপ করে থাকে। যোগব্রত সেই কতদিন আগে, প্রায় পঁচিশ বছর হল উধাও। শোনা গিয়েছিল, পাঞ্জাবের কোন গ্রামে গিয়েছিল ঘুরতে ঘুরতে, একটা পরিত্যক্ত কুয়োর ভিতরে ঝাঁপ দিয়েছিল, অন্ধকারের টানে। যোগব্রত অন্ধকার ভালবাসত। মহুয়া শুনেছে সব চিত্রভানুর কাছে। নেশার ঘোরে কতবার যে অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছে একা একা! সেই যোগব্রত মধুগঞ্জে! মধুগঞ্জ কি পাঞ্জাবে? তাহলে যা শোনা গিয়েছিল, সত্যি না? এমন তো হতেই পারে। যোগব্রত তো শুধু খেয়ে পরে বাঁচা মানুষ ছিল না। না, চিত্রভানুও তা নয়। কতবার তারা দু'জনে উধাও হয়েছে এই শহর থেকে! চিত্রভানু অবশ্য বিশ্বাস করত না, যোগব্রত অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়ে ফিরবে না। এত যে না বলে এদিক ওদিক চলে যায় চিত্রভানু, তা কি যোগব্রতর খোঁজে? কোনওদিন জিগ্যেস করে দ্যাখেনি তো মহুয়া।

হ্যালো, হ্যালো।

ফিরবে কবে? সাড়া দিল মহুয়া।

যেদিন ট্রেন আসবে, ট্রেন থামবে এখানে।

কী বলছ, এরকম হয়?

হয় মহুয়া, সবদিন ট্রেন আসে না, এলেও থামে না।

এমন কোনও জায়গা হয়? মহুয়ার ভাল লাগছিল না। সমস্ত জীবন এই করে গেল চিত্রভানু, উধাও তারপর আচমকা ফোন। আগে যখন ফোন ছিল না, উড়ে আসত পোস্ট কার্ড। এত উদ্বেগ নিয়ে কতকাল কাটানো যায়।

চিত্রভানু বলল, তোমার মনে নেই মহুয়া, সেই যে সেবার গোয়ালিয়র যাওয়ার সময় মাঝরাত্তিরে কী হল, জঙ্গলের ধারে দাঁড়িয়ে ট্রেন হুইসল দিতে লাগল! কাউকে যেন ডাকছিল। এখন বুঝতে পারছি, যোগব্রতকে। আমি কিন্তু তোমাকে বলেছিলাম, গোয়ালিয়র যেতে হবে না, চলো নেমে যাই, তুমি আটকে না দিলে সেদিন সেই রাত্রে আমরা মধুগঞ্জে পা দিতাম মহুয়া।

হয়েছে, অনেক হয়েছে, ফিরে এসো তো।

আসব মহুয়া আসব।

আছ কোথায়? মাঠের ভিতরে শুয়ে?

না না, সেই পাহাড়ের ধারে অশ্রুনদীর তীরে একটা কুটিরে, পাহাড়ের গায়ে অন্ধকারে ছবি আঁকে যোগব্রত। মহুয়া মহুয়া!

মহুয়া বলল, আমি কি তোমাকে আনতে যাব? কোন ট্রেনে, কোথায় নামব বলো? বুকুকে খবর দিচ্ছি।

হা হা করে হাসল চিত্রভানু, বুকু তার বাবাকে চেনে। তুমি শুধু শুধু এক কথা বলে যাচ্ছ, সেই যে আমি তোমাকে বলেছিলাম চলো নেমে যাই, কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না আর, তখন আমাদের সবে বিয়ে হয়েছে। তানসেনের সমাধি দেখতে গোয়ালিয়র ছুটেছিলাম। ইস! সে রাতে যদি নেমে যেতাম!

মহুয়া শিহরিত হল। এখনও চিত্রভানু এমন করে কথা বলে যে, সমস্ত রোমকূপের ভিতর দিয়ে সুগন্ধ ঢুকে যায় রক্তে। মহুয়ার চোখের সামনে সেই অন্ধকারের পৃথিবী জেগে উঠল। সত্যিই ট্রেনটা যেন কাউকে ডাক দিচ্ছিল। অথবা কারওর ঘুম ভাঙিয়ে বলছিল, এসে গিয়েছে এসে গিয়েছে, মধুগঞ্জ এসে গিয়েছে... সেই কথা এখনও মনে রেখেছে চিত্রভানু! সে তো ভুলেই গিয়েছিল! মহুয়া বলল, আমাকে না নিয়ে একা চলে গেলে ভানু, এসো, আমাকে নিয়ে যাও।

সেদিন কী ভয় না পেয়েছিলে—হা হা হা, মহুয়া এখানে বর্ষা নেমে গিয়েছে। সারাদিন টিপটিপ টিপটিপ বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে, আকাশ ভরা মেঘ, মেঘ ভরা অন্ধকার। অশ্রুনদী অন্ধকার বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মহুয়া শুনছ, শুনছ!

শুনছি, কিন্তু যোগব্রত নয়, আর কেউ তোমাকে নিয়ে গিয়েছে ওখানে।

না মহুয়া যোগব্রতই। এত বছর ধরে তাকে খুঁজে যাচ্ছি! যোগব্রত বলেছে, মধুগঞ্জের বাতাসে এমন কিছু আছে যে, মানুষ একবার এখানে নামলে আর ফিরতে পারে না, বাতাস তাকে আটকে রেখে দেয়।

কী বলছ তুমি? তুমি ফিরবে তো?

বাতাস যদি ছাড়ে, ফিরব, ফিরবই।

বাতাস যদি না করে?

চিত্রভানু বলল, আমি তোমার সঙ্গে এমনি কথা বলব, অশ্রুনদীর তীরে বসে। এখানে জল অন্ধকার, নদী অন্ধকার, আকাশ অন্ধকার, চাঁদও অন্ধকার নিয়ে জেগে ওঠে সন্ধেবেলায়, মহুয়া তুমি শুনছ?

না আমি শুনব না। কখন থেকে গ্লাস ভর্তি নিয়ে বসেছ ভানু? আমি কোনও রাতেই ঘুমোতে পারি না, ভানু তুমি ফিরে এসো।

আসছি মহুয়া আসছি, কতদিন তোমার ঠোঁট স্পর্শ করেনি আমার ঠোঁট। বললাম নেমে চলো মহুয়া, মধুগঞ্জে ট্রেন দাঁড়িয়েছে। নামলে না, তানসেনকে আমরা মধুগঞ্জেই পেয়ে যেতাম, অতদূর যেতে হত না।

থাক ভানু, ওসব কথা মনে করাতে হবে না। তুমি একটা পাগল!

আচমকা ফোন কেটে গেল। মহুয়া স্তম্ভিতের মতো বসে থাকল কিছু সময়। চিত্রভানু যখন পালায়, আগে চিঠি লিখে বর্ণনা করত ডুয়ার্সের জঙ্গল, অসমের বুড়ি ডিহিং নদী, শিবে সাগরে অহমরাজাদের তলাতল ঘর—রাজবাড়ি। সুরাপাত্র নিয়ে বসেছিল ধ্বংসস্তূপের উপর। সেইসব বর্ণনায় অসত্য কিছু তো থাকেনি কোনওদিন। একবার ফোনে বর্ণনা করেছিল, সুলতানগঞ্জে গঙ্গার চরে কেমন চন্দ্রোদয় দেখেছে। তারপর খাতা ভর্তি কবিতা, গদ্য! বুড়ি ডিহিং নদীর জল সুরার মতো মহুয়া, যদি তুমি আমি একসঙ্গে পান করতে পারতাম, বুড়ি ডিহিংয়ের ধারে ঘর বেঁধে থেকে যেতাম মহুয়া!

মহুয়া না পেরে ফোন করল ঈশিতাকে, এই অশ্রু নামের কোনও নদী আছে?

কে বলেছে, ভানুদা?

ভানু তো মিথ্যে বলে না ঈশিতা, যত নদীর কথা বলেছে, সেই ডুলং, সাংপো, ঘাঘরা, সুরমা—সব নদীই তো আছে।

তাহলে এটাও আছে, নজরুলের গানে তো আছে।

তুই জানিস্ না?

ভানুদা তো অসত্য বলে না মহুয়াদি।

ফোন রাখতেই আবার বেজে উঠল। তুলতেই চিত্রভানুর গলা, এই যোগব্রত এসে গিয়েছে, মহুয়া তুমি কথা বলবে?

তুমি কি কাঁদছ ভানু? মহুয়া ফুঁপিয়ে ওঠে।

আনন্দে, আনন্দে মহুয়া, আমার আনন্দে অশ্রুনদী আলোয় ভরে গিয়েছে, ওই দ্যাখো!

মহুয়ার চোখ টলমল করছে, চোখের মণি যেন গলে গলে গাল দিয়ে গলা দিয়ে বয়ে বুক ভিজিয়ে দিচ্ছে, সে কোনও ক্রমে বলল, সত্যি বলছ ভানু, সত্যি? সত্যি সে এসেছে?

আসে আর যায়, মধুগঞ্জে অশ্রুনদীর উপর দিয়ে বয়ে যায়, শোনো মহুয়া। শোনো সে কী বলছে, বলছে কুয়োর ভিতর থেকে উঠে এসে মধুগঞ্জের ট্রেন ধরেছিল।

মহুয়া বলল, ওকে ফোনটা দাও।

চুপচাপ হয়ে গেল ওপার। শুধু বাতাসের শব্দ শোনা যেতে লাগল। ওপার থেকে বাতাস বলল, আমি পড়তে কুয়োর ভিতরটা আলো হয়ে গেল, অন্ধকার পেলাম না মহুয়া।

তুমি কি সত্যিই সে?

হ্যাঁ হ্যাঁ, মধুগঞ্জের মধুপাহাড়ের গায়ে রং লাগিয়ে চলেছি এত বছর ধরে।

মহুয়া চুপ করে থাকল। সে বোধহয় অশ্রুপতনের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। চাপা গলায় ডাক দিল, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ?

হ্যাঁ মহুয়া, বলো।

তুমিও কি সেই নদীর ধারে?

হ্যাঁ, নদীর অন্ধকার জলের অন্ধকার কেটে গিয়েছে। চাঁদও গা থেকে অন্ধকার মুছে ফেলেছে মহুয়া, মহুয়া তোমার জন্য মন কেমন করছে!

মহুয়া বলল, আর না ভানু, তুমি তো একজনের সঙ্গে আছ। আমি যে একা, আমার কবিতা নেই, পেন্টিং নেই, শুধু একটা মানুষ আছে, সে বারবার উধাও হয়ে যায় সমস্ত জীবন ধরে, আমাকে আর কাঁদিও না।

ওপারে চিত্রভানু চুপচাপ। আর কোনও কথা নেই। মহুয়া তার ফোন নেড়েচেড়ে দেখল নিস্তব্ধ। সব কথা মরে গেল যেন। ফোন রেখে দিল মহুয়া। তার গা শিরশির করছে। যোগব্রতর কথা কি শুনল সত্যি? হায় রে যোগা! যোগা তাকে প্রেম নিবেদন করে, ব্যর্থ হয়ে কোথায় কোন মধুগঞ্জে চিরকালের মতো উধাও হল। কথাটা জানত চিত্রভানু। চিত্রভানুর ভিতরটা কত্ত বড়! কত! কত! তারপর থেকে যোগব্রতর সন্ধানে যখন তখন যেদিকে পারে চলে যায়। ফিরে আসে খাতা ভর্তি কবিতা নিয়ে, মাথা ভর্তি কথা নিয়ে। কিন্তু আজ কী কথা হয়ে যাচ্ছে! সত্যিই সে বেঁচে আছে মধুগঞ্জে? নাকি সুরাপাত্র হাতে নিয়ে চিত্রভানু মৃতের সহিত কথোপকথনে বুঁদ হয়ে আছে। হাওয়া যায় হাওয়া আসে। হাওয়ার সঙ্গে যোগব্রত আসে হাওয়ায় রঙের আঁচড় কাটতে কাটতে। অপেক্ষায় ক্লান্ত হয়ে মহুয়া টেবিল থেকে নিয়ে চিত্রভানুর ডায়েরি খুলল। যোগব্রতর মৃত্যু সংবাদ দিয়েছিল চন্দন। চন্দনকে ফোন করল সে ডায়েরি থেকে নম্বর খুঁজে নিয়ে। কথা উড়ে এল—দিস নাম্বার ডাজ নট এগজিস্ট! হতেই পারে। কত পুরনো ডায়েরি এটা। চিত্রভানু কি খুলে দ্যাখে?

সেদিন মধ্যরাতে একবার বুঝি বেজে উঠে থেমে গেল ফোন। মহুয়া তাকিয়ে থাকল যন্ত্রটির দিকে। অপেক্ষা করে থাকল, আবার যদি বেজে ওঠে। বাজল না। তাহলে কি মধুগঞ্জের অশ্রুনদীর তীর থেকে রওনা দিল চিত্রভানু?

চিত্রভানু ফিরেছিল। ট্রেনের ভিতরে রাত্রে ঘুমের ঘোরেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার কাঁধের সাইড ব্যাগের ভিতর থেকে কবিতার খাতা বেরতে, তবে না জানা গেল সে কে? চিত্রভানুর খাতায় ছিল মধুগঞ্জ আর অশ্রুনদী নিয়ে কবিতা। সে কবিতা উৎসর্গ করা ছিল পেন্টার যোগব্রতকে—যে পাহাড়-নদী-মাঠ-জঙ্গলে রঙের তুলি ছুঁইয়ে যাচ্ছে সমস্ত জীবন। সেই কবিতার কথা আমি শুনেছিলাম, ছাপার অক্ষরে দেখিনি—একদিন টেলিফোনে মহুয়াদি ডেকেছিল আমাকে, শুনবি ঈশিতা, মধুগঞ্জের কবিতা? শোন, আমি চলে যাই—

হাওয়া আসে হাওয়া যায়
হাওয়ায় ভরা মেঘ
আসে যায়, যোগব্রত হে যোগা;
কুয়োর ভিতরে হাওয়া ছিল কতখানি?

শুনতে শুনতে আমি মনে মনে বলি, না না, এ কবিতা কি চিত্রভানুর হতে পারে, আমার প্রিয় ভানুদার?

আ
আষাঢ়ে

দীপান্বিতা ঘোষ মুখোপাধ্যায়

আবছায়াতে

পশ্চিম আকাশে রক্ত-লাল আভা ছড়িয়ে আর একবার সূর্য ডুবল। এবার সেই ছড়ানো লাল রং-এ মেঘলা রং মিশে ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসবে, তারপর আকাশজোড়া অন্ধকার ফুঁড়ে দূরে আবছায়াতে পাহাড়ের মাথাগুলো জেগে থাকবে শুধু। আজ নিয়ে এগারো দিন হল, সুজন বাংলোর সরু আর লম্বা সিঁড়ির ধারে একলাটি বসে সূর্য ডোবা দেখছে। একটু একটু করে অন্ধকার জমাট বাঁধছে।

ময়ূরডিহার থেকে সেক্টর হোটেলের দূরত্ব বেশ খানিকটা। সুজন এর আগে বহুবারই এ পথে একলা গাড়ি চালিয়ে এসেছে। আজ কিছুটা এলোমেলো চালানোর জন্যে সময় একটু বেশি লাগছে। সুজন সুপটু চালক। ক্লান্তি বা বিভ্রান্তি নিয়েও অনায়াসে গাড়ি চালাতে পারে। ভয় নয়, একটা অসোয়াস্তি কাজ করছে। থানার ওসি পার্থিব খান্না সুজনের বন্ধু, অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার ভি. গৌরব যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ। এছাড়া বাদবাকি পুলিশের ওপরমহলেও সুপরিচিত। গণ্ডগোলের সম্ভাবনা সে অর্থে নেই। তবে বিগত দীর্ঘ সময়ের রেখাচিত্রে সামান্য মোচড়ই আপাতত সুজনের স্বস্তির অন্তরায়। বেভারেজের ওপর দিয়ে আঙুল চালায়। স্বাস্থ্যের কারণে সাদা তরলই তার কাছে প্রাধান্য পায়। তবে আজ কড়া কিছু না হলে, চলছে না।

—আই অ্যাম ফানহা। রিসেপশন থেকে সুজনের অনুমতি নিয়েই পাঠানো হয়েছে। এই মুহূর্তে দরজায় যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে, তার নাম সত্যি ফানহা কি না, তার বয়স কত, কী জাত বা ধর্ম, এড্‌স কিংবা সিফিলিস আছে, না নেই—সে সব কিছুই সুজন জানে না।

—প্লিজ, কাম ইন। চোপড়ার মডেলিং এজেন্সি থেকে মেয়ে শরীর চাখবার এই বন্দোবস্ত বহুদিনের। নারী বা পুরুষ কারওর সঙ্গেই মানসিক ঘনিষ্ঠতার কোনও প্রয়োজন সুজনের হয় না। তবে শারীরিক তাগাদাটা সে কখনওই অবজ্ঞা করে না।

—মে আই? সিগারেটের জন্যে হাত বাড়ায় ফানহা। ঠোঁটে এক চিলতে হাসি নিয়ে সোফায় এমনভাবে বসে আছে, যাতে তার সাহসী পোশাক, অনেকখানি অনাবৃত বুক, সামনে বসা যে কাউকে খুব সহজে দেখাতে পারে। টুকটুকে লাল চামড়ার ফিতে বাঁধা, পেডিকিওর করা মোম তকতকে পা, সামনের দিকে ছড়ানো। সুজনের গা ঘেঁষে বসে দ্রুত মদ আর সিগারেট শেষ করছে। শরীরের উচ্চাবচ অংশ মাঝে মাঝে সুজনের বাহু ছুঁয়ে যাচ্ছে। এক ধরনের শরীরী আমন্ত্রণ। বেশ কিছুদিন হল, অনাবৃত মধ্যমাঙ্গ, ডাক্তারি পরিভাষায় যাকে বলে লয়েন, না দেখা পর্যন্ত সুজন কোনও তাগাদা অনুভব করে না। সামান্য ইঙ্গিতে নিজেকে মেলে ধরেছে ফানহা। আবছা অন্ধকারে সুজনের শরীরটা হিম হয়ে আসে। নাভির দু'দিকে দু'টো চোখ, লয়েন রিজিয়ন পর্যন্ত উল্কি করা। অবিকল বাঈয়ের মতোন। অপারেশন করতে গিয়ে দেখেছিল। চোখ বন্ধ করে ফেলে। সুজনের নিচু হয়ে আসা মুখ, তার উপত্যকার মতো নাভির ওপর দু'হাতে চেপে ধরেছে ফানহা। ক্রমশ দম বন্ধ হয়ে আসছে। উল্কির নীলচে সবুজ

রং দু'চোখের মধ্যে দিয়ে মাথার ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছে। মনে হচ্ছে, মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। সুজনের বলিষ্ঠ ধাক্কায় ফানহা ছিটকে পড়ে যায়।

—এনি থিং রং? একটু অপরাধী মুখ ফানহার। দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে জলের দিকে হাত বাড়ায় সুজন। আকণ্ঠ তেষ্টা।

অন্ধকার চিরে বহু দূরে দু'একটা চলন্ত আলো হয় রাস্তায়, নয়তো আকাশে। কাচের দেওয়ালের ধারে স্খলিত সুজন। বহু কষ্টে ফানহাকে বোঝানো গিয়েছে, সে যথেষ্ট আকর্ষণীয়, আসলে যে কোনও কারণেই হোক, সুজনেরই আজ একটু অসুবিধে হচ্ছে। দ্বিগুণ টাকায় হোটেল থেকে গাড়ি ভাড়া করে বাড়ি পাঠিয়েছে, ফানহাকে। কথা দিয়েছে চোপড়াকে জানিয়ে দেবে,

—উই হ্যাড আ গালা টাইম।

বাঈ ছিল সুজনের প্রথম শিকার। ডাঃ জোশির নার্সিং হোমে মাস কয়েক কাজ করার পর স্নেহা ভর্তি হয়েছিল। অকেজো দু'টো কিডনি, রোগে জরজর শরীর, মৃত্যুর কাছাকাছি স্নেহা ছিল, ধনীকন্যা। স্নেহার বাবার দুর্মূল্য পাথরের ব্যবসা ছিল। বাবা বা মা—কারওর সঙ্গেই ব্লাড গ্রুপ মেলেনি। ডোনারও পাওয়া যায়নি। বাঈ সুজনের রান্না করত, ঘর 'ঝাড়ুপোছা' করত, 'বর্তন সাফা' করত। একবার ম্যালেরিয়া হওয়াতে সুজনই বাঈয়ের ব্লাড টেস্ট করায়। বাঈয়ের ব্লাড গ্রুপ 'ও' নেগেটিভ, সুজন জানত। স্নেহার জন্যে একটা কিডনি যে কোনও মূল্যে স্নেহার বাবা কিনতে রাজি ছিল। সুজন বুঝেছিল, স্নেহার একটা কিডনির বিনিময় মূল্য তার নিজস্ব নার্সিং হোম। বাঈকে বুঝিয়েছিল, একটা ছোট আধ ঘণ্টার অপারেশন করালে, বাঈয়ের যে মাঝে মাঝে পেটে ব্যথা হয় তা সেরে যাবে, জ্বরজারি হবে না, খিদে কম পাবে, 'তন্দুরুস্ত' থাকবে।

—ডর লাগতা হ্যায়।

—দো দিনকে অন্দর খানা পাকানে সকোগে। ম্যায় জো হুঁ না।

স্নেহার বাবা বাসুদেও পরঞ্জাপের অগাধ টাকার জোরে অবৈধ এবং অমানবিক উপায়ে স্নেহা বেঁচে গেল। দু'দিনের মধ্যে বাঈ মারা গেল। ডেথ সার্টিফিকেট লিখে, দীক্ষিত কোম্পানির 'সোয়ারগ রথ' ভাড়া করে, মৃত বাঈয়ের শরীরের ওপর এক বোঝা রজনীগন্ধা চাপিয়ে অনায়াসে সৎকার সেরে ফেলল সুজন। পুরো ব্যাপারটায় প্রধান সহযোগী ছিল জোশির নার্সিং হোমের ফার্মাসির অ্যাকাউন্ট্যান্ট শর্মা। সুজন কিছু বেশি টাকায় নিজের নার্সিং হোমে কাজ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল মাত্র। সুজন কথা রেখেছে। শর্মা এখন তার ছায়াসঙ্গী।

চক্রাকারে একটা অন্ধকার ঘুরছে, আর সেই তীব্র অন্ধকার চিরে শুধু মাত্র একটা দৃষ্টি সুজনকে তাড়া করছে। কারওর চোখ নয়, মুখ নয়, দেহ নয়, শুধু কার যেন দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে সুজনের ওপর। সুজনকে পালাতে হবে ওই বোবা দৃষ্টির আওতার বাইরে। হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠে। অন্ধকার রাজপথ চিরে গতিবেগের কাঁটা দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়। হঠাৎই শিরশিরিয়ে ওঠে সুজনের সমস্ত শরীর। পা অবশ হয়ে আসে। নিজেকে আপ্রাণ টেনে তুলতে চেষ্টা করে সুজন। বেএক্তিয়ার গাড়ি টালমাটাল। গাড়ির পিছনের সিট থেকে সেই নির্নিমেষ দৃষ্টি সুজনের দিকে চেয়ে আছে। চোখ ধাঁধানো আলো সামনে—ট্রাক না পুলিশ ভ্যান? সমস্ত প্রচেষ্টা ব্রেকের ওপর। সারা শরীরে ঘামের স্রোত, মেরুদণ্ডে অজানা শিহরণ। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে উঠে বসে সুজন। সোফাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। হুইস্কির বোতল প্রায় খালি। অন্ধকার আকাশটা যাই যাই করছে। এই প্রথম সুজনের মনে হল, তার মা বা বাবা কোথায় কে জানে!

সুজনের মা ছিল বাঙালি, বাবা পাঞ্জাবি। চোদ্দ-পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত কলকাতার মাটিতে কাটিয়ে ইলিশ মাছ, নলেন গুড় আর ময়দানের ফুটবলে আকণ্ঠ ডুবে যখন সুজন পুরোদস্তুর বাঙালি কিশোর, তখন সুজনের মা পালিয়ে গেল, বাবার বিজনেস পার্টনার ঝা'য়ের সঙ্গে খোঁজখবর করে বাবা সুজনকে নিয়ে পাটনায় ঝা'য়ের বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিল। মস্ত হাভেলির দোতলার লতাপাতা আঁকা দরজা খুলে, মা নয়, শরবত হাতে নওকরানি এসেছিল,—অব মালকিন কা ফুরসৎ নহি হ্যায়। আপ ফির কভি আইয়েগা। হাভেলি থেকে বেরিয়ে জল চাইতেই, ঠাস করে এক চড় কষিয়ে বাবা বলেছিল, 'হিন্দি বোল।' বাকি রাস্তাটা প্রায় দু'টো অপরিচিত মানুষের মতো বাড়ি ফিরেছিল দু'জনে। সুজনদের বাড়িটা চালাত দু'জন কাজের লোক। মেজাজ খারাপ থাকলে মাঝে মধ্যে পিটুনি ছাড়া বাবার সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। বছর খানেকের মধ্যে ব্যবসা গুটিয়ে ইউ. পি চলে এল সুজনের বাবা। সুজনকে লাখ খানেক টাকার বিনিময়ে এক অনামী মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়তে ঢুকিয়ে দিল। সাউথ দিল্লিতে ডাঃ জোশির 'সেবা'র যথেষ্ট নামডাক ছিল। হাউজস্টাফশিপ শেষ করেই সুজন সেখানকার আর.এম.ও পদে বহাল হয়ে গেল। বাক্স গুছিয়ে বাড়ি থেকে চলে আসার পর আর, বাবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার কোনও তাগাদা অনুভব করেনি। প্রায় বছর দশেক হয়ে গেল ময়ূরডিহার নার্সিং হোম শাখাপ্রশাখা নিয়ে বটগাছের মতো বিস্তৃত। সাধারণ চিকিৎসা এখানকার বহিরঙ্গ মাত্র। ভারতীয় পুলিশ এবং বিচার ব্যবস্থা ঠিক ছাঁকনির মতো। জল হয়ে নির্গত হতে পারলে অর্থ ও প্রতিপত্তির বিস্তৃত পারাবার। বাঈ মারা যাওয়ার কিছুদিন বাদে বাঈয়ের এক ছেলে খোঁজ করতে এসেছিল। অম্লান বদনে সুজন জানিয়েছিল, বাঈ তিনদিন আগে বাড়ি চলে গিয়েছে। ময়ূরডিহার নার্সিং হোমে চলে আসবার পর শুনেছিল, বাঈয়ের মেয়ে এসে কান্নাকাটি করে গিয়েছে। কোথা থেকে নাকি শুনে এসেছে, তার মা মরে গিয়েছে। সুজন বিশ্বাস করত, একটা জীবন চলে যায় একটা কিডনিতে, বিশেষ করে যে জীবনের দাম কম। কিডনি পাচার চক্র চালানোর শিকার, গ্রাম থেকে আসা একদল একলা মানুষ। সহায়, সম্বল, খুঁটি, মূল—কিচ্ছু যাদের নেই। নানা স্তরে কাজ চলে। রোগীর খবর আনা, যোগাযোগ করা, রাস্তায় দিনমজুর এবং হতদরিদ্র যারা তাদের ওপর নজর রাখা, মাঝে মাঝে এনজিও সেজে খাবারদাবার বিলোনো এবং বিশ্বাস অর্জন। বাকি, কাজটুকুর জন্যে শুধু স্তোকবাক্য দিয়ে নার্সিং হোমে নিয়ে আসা। অপারেশনের পর কখন,

কীভাবে, কোথায়, কাকে পাঠানো হবে, তা নিয়ে সুজনকে মাথা ঘামাতে হয় না। ডি. শর্মা, ম্যানেজার ময়ূরভিহার নার্সিং হোম, বাকিটুকুর দায়িত্ব নেয়। এলাকার লোকজনকে প্রথমেই এ শিকারখেলার বাইরে রাখবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। দিন পাঁচেক আগে মুন্না বলে একটা বছর বাইশের ছেলের অপারেশন হয়েছে। এত কম বয়সের কেউ এর আগে আসেনি। কী বুঝিয়ে আনা হয়েছে, সুজন কখনও জানতে চায় না, এবারেও চায়নি। আজ দুপুরে মুন্না মারা গিয়েছে। বাকি বন্দোবস্ত শর্মার দায়িত্ব। তাই কথামতো সেন্টার আসবার ব্যবস্থায় কোনও নড়চড় হয়নি।

অন্ধকার আকাশের গায়ে একটু একটু করে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে হারানো আত্মবিশ্বাসের তল পাচ্ছে, সুজন। কাল হুইস্কির মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে মোবাইল খুলতেই ভয়েসমেলে শর্মার সন্ত্রস্ত গলা পায়,—গজব হো গয়া স্যর। মেসেজ মিলনে সে ফোন কিজিয়েগা। সংক্ষেপে শর্মা জানাল, কাল সন্ধেবেলা মুন্নার দাদার সঙ্গে বেশ কয়েকজন, মুন্নার খোঁজ নিতে এসেছিল। ঘনিষ্ঠ কেউ থাকলে সাধারণত তাদের এড়িয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া আছে। কেন তাহলে মুন্নাকে আনা হল? কাছাকাছি দোকানে যে কাজ করত, এ কথা আগে জানা যায়নি কেন? এসব প্রশ্ন এখন অবান্তর। শর্মা তাদের কাছে যথারীতি সমস্তটা অস্বীকার করেছে। রাত ন'টা নাগাদ লোকাল থানার সেকেন্ড অফিসার এসেছিল, সঙ্গে একটা নিউজ চ্যানেল। শর্মা শুধুই ম্যানেজার। তাই পুলিশকে জানিয়েছে, সুজন তিনদিন বাদে ফিরবে। সেকেন্ড অফিসারটির, ওসির সঙ্গে সুজনের দহরম-মহরমের কথাটা অজানা নয়। তাই শর্মাকে শুধুই শাসিয়ে আর সুজনের মোবাইল নম্বর নিয়ে চলে গিয়েছে।

—ভাগ জানে কা মওকা দিয়া স্যর। জিধর ভি হো, আপ ভাগ যাইয়ে।

জয়পুর হয়ে কলকাতা। দিল্লি আর জয়পুরে চার-পাঁচটা ব্যাঙ্কের এটিএম থেকে টাকা জড়ো করেছে সুজন। কলকাতায় টাকা তোলা যাবে না। এটিএমের সূত্র ধরে পুলিশ খোঁজ পেতে পারে। সাদার স্ট্রিটের হোটেলটায় দু'দিন সম্পূর্ণ ঘরবন্দি অবস্থায় কাটাল। এ ধরনের জৌলুসহীন ঘরে তার বহুদিন থাকবার অভ্যেস নেই। টিভিতে, খবরের কাগজে তার ছবি। তবে ছবিটা বেশ কিছুদিন আগের। তাই রোদচশমায় মুখ ঢেকে

রাস্তাঘাটে একেবারে বেরনো যায় না, এমন নয়। সুজন অযথা ঝুঁকি নেয়নি। হোটেলের ম্যানেজার অ্যান্টনি। রোগা, তামাটে চেহারা; ঠোঁটে আলগা করে ধরা সিগারেটের সঙ্গে দু ধ্য হাসি।

—ট্যুরিস্ট একদম নেহি হোনা চাহিয়ে। কিউ? ভাগনা চাহতা হো?

সেই দুর্বোধ্য হাসির বিস্তৃতি আর চোখের তারার ভঙ্গিতে সুজন বুঝল, পাকা খেলোয়াড়। অনেক টাকায় রফা হল, অ্যান্টনির সঙ্গে। উপায় নেই। রসদ জোগানোর জন্যেও তো লোক চাই একটা। অ্যান্টনির পরামর্শ আর যোগাযোগ মতো সামসিং চা-বাগানে পৌঁছে সুজন একটু নিশ্চিন্ত বোধ করে। চা-বাগানটা বন্ধ। তাই আশপাশটা প্রায় জনমানবহীন। বস্তির কঙ্কালটুকু অবশিষ্ট মাত্র। প্রায় সব বাড়ি খালি। জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যেও লোক পাওয়া মুশকিল। যারা রয়েছে, অনাহার, অর্ধাহারে মৃত প্রায়, অবিচার, অত্যাচারে সন্দিহান। তামাং, চৌথা গলি, দশ নম্বর—এটুকুই যোগাযোগের সূত্র। ইশারা আর দু'এক কথার ওপর নির্ভর করে, শেষ পর্যন্ত তামাংকে পাওয়া গেল। হতশ্রী চেহারা, মুখ জুড়ে অসংখ্য ভাঁজ, নুয়ে পড়া চোখে ঘোলাটে দৃষ্টি।

—কলকাত্তা সে অ্যান্টনিসাব ভেজা। অ্যা নির নির্দেশমতো একটা পঞ্চাশটাকার নোট বাড়িয়ে দেয় সুজন। গিভ দেম মানি। বাট নট মাচ অ্যাট এ টাইম।

গলার আওয়াজ শোনা যায় তামাংয়ের। মুখের ভাবও বদল হয়।

—অ্যান্টনিসাব?

সাত সকালেই নেশা করে রয়েছে।

মস্ত লোহার গেটের একটাই পাল্লা অবশিষ্ট রয়েছে। বাংলোর হাতায় ছড়ানো জমির দু'পাশটা খাদে ঠেকেছে। বাংলোর পিছন দিয়ে ঢুকতে হল। সামনে সুদীর্ঘ কোলাপসেবল গেটের তালার বহর দেখে মনে হল, আবহমানকাল ধরে বন্ধ রয়েছে। লাল মেঝে, উঁচু সিলিং, মস্ত জনশূন্য বাংলোর নিঃস্তব্ধতা ভাঙছে, শুধু মূর্তির আওয়াজ। কলরোল নয়, তিরতিরে একটা শব্দ খাদ বেয়ে চলা ক্ষীণকটি মূর্তি নদী, হাওয়ায় ভাসিয়ে দিচ্ছে। দ্বিতীয়বার সুজনের মনে হল, পৃথিবীতে সে সম্পূর্ণ একা। সামসিং বাংলোতেই 'এখনকার মতো' লিখলে ভাল হয় না সুজনের অজ্ঞাতবাস। সময়ের পরিমাপ করতে যাওয়ার বৃথা চেষ্টার মধ্যে না গিয়ে দিন চালানোর ব্যবস্থাটা পাকা করে ফেলাটা জরুরি। খাবারদাবার তামাংই বাড়ি থেকে এনে দেবে। সারা দিন কিছুটা সময়ও কাটাতে পারে। কিন্তু রাতে থাকবে না। দর ক কষি করবার মতো অবস্থায় নেই সুজন। খাট বিছানা অব্যবহারে জীর্ণ। তামাংকে দিয়েই শয়নযোগ্য করতে হবে। লোকটি কাজের, সন্দেহ নেই। তবে সকাল থেকেই ছাং খেয়ে থাকে। দ্বিতীয়দিন তামাংয়ের সঙ্গে বাংলোটা ঘুরে দেখল সুজন। ব্রিটিশ আমলের স্থাপত্য। সারিসারি অর্ধচন্দ্রাকার গাঁথনি মাটির ওপর যোগ রয়েছে। বেসমেন্টের মাথা।

—ঘোড়ে কা আস্তাবল।

—কঁহাসে নিকালতা?

—আসলি বাত কুছ অলগ হ্যায়।

'আসলি বাত' বলতে গিয়ে নেশাগ্রস্ত তামাং দীর্ঘ গল্প ফাঁদে। চা-বাগানের অবাধ্য কুলিদের আটকে রাখা হত ওই কারুকাজ করা পাতালঘরে। কখনও-সখনও মেরেও ফেলা হত। মৃতদেহ খাদের ধার দিয়ে গড়িয়ে দিলে সোজা মূর্তিতে। এখনকার মতো 'দুবলি' নয়, উত্তাল, রক্তচক্ষু নদী ছিল মূর্তি। একবার শুধু 'নান্নাশের জং' লড়েছিল।

—নান্নাশের করকে পুকারা যাতা। উমর কঁহি বিশ-বাইশ সাল হোগা। খুন কর ডালা সাহাবকো।

—আংরেজ সরকার কা জমানা থা?

প্রশ্ন শুনে র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তামাং। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে।

—নান্নাশের কঁহি বার বাপস লওটা।

বোঝা গেল, চা-বাগানের স্বেচ্ছাচারী মালিক বা ম্যানেজার সম্প্রদায়ের অনেক খুন নান্নাশেরের নামে চালানো হয়েছে।

আজ নিয়ে এগারো দিন সুজন বাংলোর কারাগারে বন্দি। প্রতিটা মুহূর্ত অবিশ্বাস্য রকমের দীর্ঘ। শুধু সন্ধে থেকে রাত দ্রুত কাটে নেশার ঘোরে। নিজেকে ক্রমশ কীটের মতো লাগছে।

—রাম নহি মিলা সাব. ছাং লায়া। বিকেলের দিকেই কিছুটা খেয়ে ফেলেছে সুজন। তামাং কখন চলে গিয়েছে, টের পায়নি। ঘুম ভাঙে কুচকুচে অন্ধকারে। ঝনঝন আওয়াজে সামনের গেটটা ভেঙে যাবে মনে হচ্ছে। তামাং ফিরে এল নাকি? জানলা দিয়ে বাইরে তাকায় সুজন। কারা ওরা? পুলিশ? অ্যান্টনি না তামাং? কে খবর দিল? পিছনের দরজা দিয়ে পালাতে হবে। বাংলোর পিছন দিককার জমিটা পাহাড়ে ঠেকেছে। শক্ত করে আঁটা ছিটকিনিটা অতি ক খোলে। নামতে গিয়ে পিছু হঠতে হয়। পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মস্ত কালো ঘোড়া আর তার সওয়ার। হৃৎপিণ্ড থমকে যায় সুজনের। খোলা ভোজালি হাতে মুন্না! তবে কি সুজন ভুল জানত—মুন্না মারা যায়নি? তা কী করে সম্ভব! ভাববার অবকাশ নেই। প্রাণপণ চেষ্টায় ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা মারছে। প্রায় মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে সুজন। অজানা আওয়াজ অশরীরী রাত্রির নিঃস্তব্ধতা ভাঙছে। হঠাৎ মনে হয়, চতুর্দিকে জমাট বাঁধা ভয়, রক্ত চলাচল বুঝিবা বন্ধ হয়ে যাবে। অন্ধকার ফুঁড়ে ক্রমশ সেই বোবা দৃষ্টি ধেয়ে আসছে। সুজনকে পালাতে হবে।

সুজন কাপাডিয়ার রক্তাক্ত দেহটা, পুলিশ মূর্তির ধারে খাদ থেকে উদ্ধার করার পর জানিয়েছিল, আত্মহত্যা। খবরের মাধ্যমের দৌলতে জনসাধারণ বিশ্বাস করেছিল আত্মহত্যা। শুধু তামা কিছুতেই মেনে নেয়নি। আস্তাবলের দরজা থেকে বাংলোর মাঠময় সে ঘোড়ার খুরের দাগ দেখেছে। এমনকী সাবের ঘরের বাইরেও লাল মেঝেতে কাদা-মাখা খুরের ছাপ পেয়েছে। কেউ জিগ্যেস করলে এখনও বলে,

—নান্নাশের নে হি সাবকো মারা, মগর কিঁউ, ইয়ে মুঝে মালুম নহি। সাব আচ্ছা থা।

ছবি তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শোরুম ও অনুমোদিত বিক্রয়কেন্দ্রঃ কলকাতা লিন্ডসে স্ট্রিট (২২৮৬১৫১১), ফ্রি স্কুল স্ট্রিট (২২৮৬১৫০৬), কলেজ স্ট্রিট শোরুম (মার্কাস স্কোয়ার ২২১৯৭৯৮৪), বেহালা মার্কেট (২৪৬৮১৩৪১), গড়িয়া বসু মার্কেট (২৪৩০৩০৭৬) হাওড়া(২৬৪১০৬০৮)
ডোমজুড় ■ নৈহাটী ■ বর্ধমান ■ দুর্গাপুর ■ আসানসোল ■ বহরমপুর ■ পুরুলিয়া ■ জামশেদপুর ■ ধানবাদ ■ রাঁচি ■ হাজারিবাগ ■ ভাগলপুর ■ মুজফ্‌ফরপুর ■ পাটনা ■ কটক ■ ভুবনেশ্বর ■ আগরতলা ■ বারানসী ■ রায়পুর ■ গুয়াহাটি ■ দিল্লী

আ

আষাঢ়ে

রমানাথ রায়

১

মিথ্যে কথা বলব না। আমি কিন্তু প্রথমে চুমকির প্রেমে পড়ি। চুমকির শ্যামলা রং। মাথায় কোঁকড়া চুল। পটলচেরা চোখ। মুখশ্রীও ভাল। বছরখানেক তার সঙ্গে ঘুরে বেড়ালাম। চুমুও খেলাম। সেও খেল। তবে মনে মনে কোনওদিন চুমকিকে বিয়ে করার কথা ভাবতাম না। কারণ ওর গায়ের শ্যামলা রং আমার কিছুতেই পছন্দ হত না। তবে মুখে সেকথা বলতাম না। সবসময় তার রূপের প্রশংসা করতাম। চুমকি আমার কথা বিশ্বাস করত। জানত না, আমি তলে তলে একটা ফর্সা মেয়ে খুঁজছি। জানত না, ফর্সা মেয়ের ওপর আমার একটা অদ্ভুত দুর্বলতা আছে। জানত না, একটা ফর্সা মেয়ে পেলেই ওকে ছেড়ে দেব। কিন্তু ফর্সা মেয়ে কোথায় পাব? বেশির ভাগ মেয়ের শ্যামলা রং। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। করতে করতে আমার কপাল খুলল। একদিন একটা ফর্সা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। মেয়েটার নাম পায়েল। আমি পায়েলদের বাড়ি গেলাম। পায়েল আমাদের বাড়ি এল। তারপর আমরা একসঙ্গে ঘুরতে লাগলাম। আমি পায়েলকে ভালবেসে ফেললাম। পায়েলও আমাকে ভালবেসে ফেলল। ভালবাসার সময় মাঝে মাঝে চুমকির কথা মনে পড়ল। চুমকির জন্যে দুঃখ হল। হলেও করার কিছু নেই। আমি একই সঙ্গে দু'জনকে ভালবাসব। তবে একটা ভয় থেকে গেল। ভয়, ধরা পড়ে যাব না তো! ধরা পড়লে কিন্তু কেলেঙ্কারির শেষ থাকবে না। আমি দু'জনকেই হারাব। শুধু তাই নয়, দু'জনেই আমার জীবন নরক করে তুলবে। অতএব আমাকে খুব সাবধানে চলতে হবে।

কিন্তু মেয়েদের একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। তারা কী করে যেন সব টের পেয়ে যায়। আসলে মেয়েরা ভীষণ সন্দেহপ্রবণ।

একদিন কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে আমি আর চুমকি দু'কাপ কফি নিয়ে গল্প করছিলাম। তখন সকাল এগারোটা। এমন সময় পকেটে মোবাইল বেজে উঠল। এ সময় আবার কার ফোন এল? বিরক্তিকর। পকেট থেকে মোবাইল বের করে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে দেখি পায়েল ফোন করেছে। সর্বনাশ! এখন কী করব?

চুমকি জিগ্যেস করল, কার ফোন?

—এক বন্ধুর ফোন।

বলে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলাম।

এসে ফোনটা ধরলাম।

—হ্যালো...

পায়েল জিগ্যেস করল, তুমি এখন কোথায়?

মিথ্যে কথা বললাম, শ্যামবাজারে।

—কী করছ?

আবার মিথ্যে কথা বললাম, ইলেকট্রিকের বিল জমা দিতে এসেছি।

—বিল জমা দিয়ে একবার বাড়িতে আসতে পারবে?

আবার মিথ্যে কথা বলতে হল, সম্ভব নয়। বিশাল লাইন পড়েছে।

—তাহলে কাল এসো।

—[illegible]

—কখন?

—সকালে

বলে ফোনের লাইন কেটে দিলাম। দিয়ে ঘরে ঢুকলাম। টেবিলে এসে বসলাম। বসতেই দেখি চুমকির মুখের চেহারা বদলে গিয়েছে। ভীষণ রেগে আছে।

চুমকি জিগ্যেস করল, কার ফোন? সত্যি কথা বলো।

—এক বন্ধুর ফোন।

—মিথ্যে কথা।

—মিথ্যে কথা কেন?

—বন্ধুর ফোন হলে টেবিলে বসেই কথা বলতে। বাইরে বেরিয়ে যেতে না।

—কী বলছ তুমি! এখানে বসে কথা বলা যায়?

—কেন যাবে না?

—চারপাশে এত কথা, এত শব্দ যে আমি তার কথা শুনতে পাব না। সেও আমার কথা শুনতে পাবে না।

—বাজে কথা। দেখি তোমার মোবাইলটা।

—মোবাইল দিয়ে কী হবে?

—দেখব, তুমি কাকে ফোন করেছ।

—না, দেখতে হবে না।

—আমি দেখব। দাও মোবাইলটা।

—না, দেব না।

—তাহলে তোমার সঙ্গে আর আমার কোনও সম্পর্ক নেই।

বলে চুমকি উঠে পড়ল।

জিগ্যেস করলাম, কোথায় যাচ্ছ?

চুমকি আমার প্রশ্নের উত্তর দিল না। না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি কী করব বুঝতে পারলাম না। চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তারপর ভাবলাম, ভালই হল। আমি তো চুমকির সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করতে চেয়েছিলাম। এত সহজে সেটা হয়ে গেল দেখে খুশি হলাম। আমি এখন নিশ্চিন্ত। চুমকি আর আমাকে ফোন করবে না। আমিও আর চুমকিকে ফোন করব না। চুমকি আস্তে আস্তে আমাকে ভুলে যাবে। আমিও চুমকিকে ভুলে যাব। এতে পায়েলের সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে আর আমার অসুবিধে হবে না।

কিন্তু পরদিন একটা বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটল। চুমকির মা আমাকে ফোন করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, চুমকি আর নেই।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে জিগ্যেস করলাম, মানে?

—চুমকি কাল রাতে আত্মহত্যা করেছে।

—কেন?

—জানি না

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে জিগ্যেস করলাম, কিছু লিখে গিয়েছে?

—না।

ঘাম দিয়ে আমার যেন জ্বর ছাড়ল। আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। চুমকি যদি তার মৃত্যুর জন্যে আমাকে দায়ী করে লিখে যেত, তাহলে আমার হাজতবাস কেউ আটকাতে পারত না। আমি মনে মনে চুমকির আত্মাকে ধন্যবাদ জানালাম। তারপর চুমকির মা'কে বললাম, মাসিমা, আমি এখনই আসছি।

চুমকির মা বলল, তাড়াতাড়ি এসো। তুমি এসময় পাশে থাকলে খুব ভাল হয়।

আমি ফোন রেখে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

২

এরপর তিনমাস কেটে গিয়েছে।

একদিন আমি আর পায়েল সন্ধেবেলা রবীন্দ্রসদনের সিঁড়িতে বসেছিলাম। চারদিক বেশ ফাঁকা। আমরা নানা বিষয় নিয়ে নানা কথা বলছিলাম। বলতে বলতে পায়েল হঠাৎ বলল, আমার বাবা তোমাকে ডেকেছে।

কৌতূহলী হয়ে জিগ্যেস করলাম, কেন?

—বোধহয় বিয়ের কথা বলবে।

—এখনই বিয়ের তাড়া কেন?

—জানি না। তুমি একবার বাবার সঙ্গে দেখা করো।

—কবে?

—কাল সন্ধেবেলা এসো। আসবে তো?

—আসব।

তারপর আরও কিছুক্ষণ গল্প করে বাড়ি চলে এলাম। এসে কিছুক্ষণ বাবা-মা'র পাশে বসে টিভি দেখলাম। দেখার পর খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে বিয়ের কথা ভাবতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করা উচিত হবে কি না। কারণ প্রেম করায় ঝামেলা নেই। কিন্তু বিয়ে করলে হাজার ঝামেলা পোহাতে হবে। কী করব তাহলে? কাল কি পায়েলের বাবার সঙ্গে দেখা করব? যদি না করি পায়েল রেগে যাবে। পায়েল আমার হাতছাড়া হবে। তখন পায়েলের মতো ফর্সা মেয়ে পাওয়া কঠিন হবে।

এইসব ভাবতে ভাবতে রাত বাড়তে লাগল। ঘরের হাল্কা নীল আলোয় সবকিছু অস্পষ্ট হয়ে আছে। কিছুতেই ঘুম আসছে না। আর ঠিক তখনই আমার কপালে একটা ঠান্ডা হাতের ছোঁয়া লাগল। আমার সারা শরীর শিরশির করে উঠল। আমি উঠে বসলাম। বসতেই দেখি একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

জিগ্যেস করলাম, কে?

ছায়ামূর্তি বলল, আমি চুমকি। আমাকে চিনতে পারছ না?

আমি শিউরে উঠলাম, তুমি কেন? কী চাও? কেন এসেছ?

ছায়ামূর্তি বলল, তুমি পায়েলকে বিয়ে কোরো না।

—কেন?

—মেয়েটা ভাল নয়। তা ছাড়া...

—তা ছাড়া কী?

—আগে ওর দু'বার বিয়ে হয়েছিল। তো...কে এ নিয়ে কিছু বলেছে?

—না।

—অতএব সাবধান।

বলে ছায়ামূর্তি মিলিয়ে গেল।

আমি হতভম্ব হয়ে বিছানায় বসে রইলাম।

৩

পায়েলের বাবার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। আমি দেখা না করে পায়েলকে ফোনে জানিয়ে দিলাম। আজ যেতে পারব না। কবে যেতে পারব, তা ফোন করে জানিয়ে দেব। পায়েল এতে রেগে গেল। রাগুক। আমি এখন পায়েলের অতীত ইতিহাস জানতে চাই। টাকা খরচ করে গোয়েন্দা লাগিয়ে দিলাম। এক সপ্তাহ পরে গোয়েন্দা জানাল, পায়েলের আগে সত্যি সত্যি দু'বার বিয়ে হয়েছিল। দু'জনের সঙ্গেই ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, মামলা করে দু'জনের কাছ থেকে ভাল টাকা আদায় করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্ত হয়ে পায়েলকে ফোন করে জিগ্যেস করলাম, তোমার আগে দু'বার বিয়ে হয়েছিল। একথা আমাকে বলোনি কেন? উত্তরে পায়েল কিছু না বলে ফোন নামিয়ে রাখল। দ্বিতীয়বার আর পায়েলকে ফোন করলাম না। পায়েলও করল না। মনে মনে চুমকিকে ধন্যবাদ দিলাম। চুমকির জন্যে খুব জোর বেঁচে গিয়েছি।

এবার চুমকির জন্যে আমার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। চুমকির সঙ্গে আমি যে অন্যায় করেছি তার জন্যে দুঃখ হতে লাগল। চোখ ফেটে জল চলে এল। ভাল করে খেতে পারলাম না। ঘুমোতে পারলাম না। রাত্রির অন্ধকারে রোজ বলতে লাগলাম, চুমকি! আমাকে একবার দেখা দাও। আমি অন্যায় করেছি। আমাকে ক্ষমা করো।

একদিন রাত্রে চুমকির ছায়ামূর্তি আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমি তাকে ধরতে গেলাম। সে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। তারপর আর চুমকি দেখা দেয়নি।

Approach Roads & Bridges

Multi-product SEZ's

Several Small & Medium Scale Enterprises

Health, Education & Residential Developments

Over 17 lakh job opportunities

Coming Soon

NKID

NEW KOLKATA INTERNATIONAL DEVELOPMENT

A City of New Opportunities

A City of New Opportunities

For the growth and transformation of the economic and social landscape of West Bengal.

unitech | Shrachi | USE Universal Success

Chowringhee Court, 4th Floor, 55 & 55/1, Chowringhee Road, Kolkata - 700 071

033-40026160

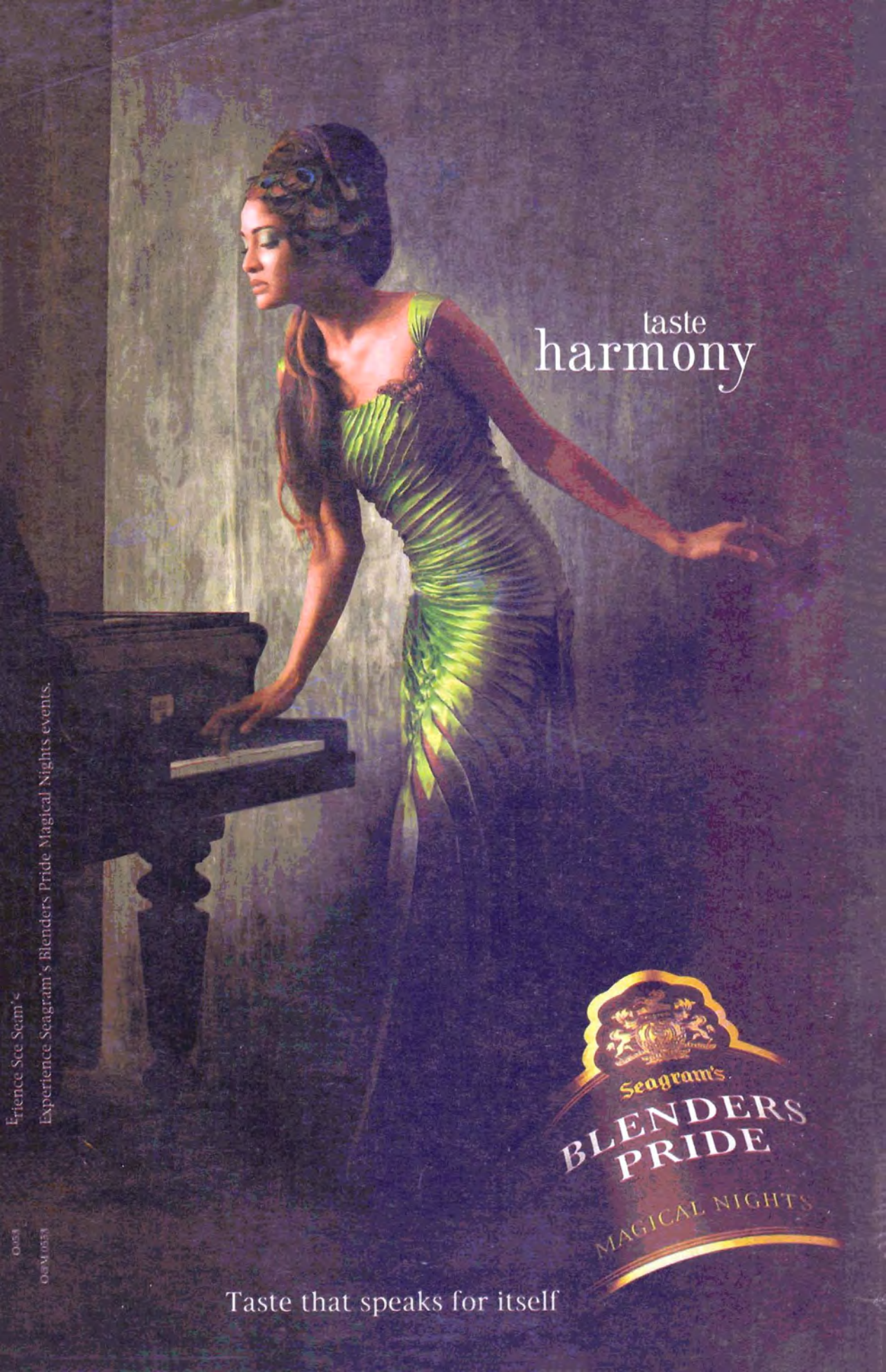

taste
harmony
Experience Seagram's Blenders Pride Magical Nights events.
Seagram's
BLENDERS
PRIDE
MAGICAL NIGHTS
Taste that speaks for itself